অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আপন কথা

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আপন কথা

আপন কথা

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আনন্দ

প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ১৯৮৮
প্রথম ই-বুক সংস্করণ: ২০২০

ISBN 978-81-7066-712-4 (print)
ISBN 978-93-90048-48-9 (e-book)

প্রকাশক: আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
হেড অফিস: ৯৫ শরৎ বোস রোড, কলকাতা ৭০০ ০২৬
রেজিস্টার্ড অফিস: ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯

CIN: U22121WB1957PTC023534

প্রচ্ছদ: অমিয় ভট্টাচার্য

সূচী

এই লেখকের অন্যান্য বই

খাতাঞ্চির খাতা
ক্ষীরের পুতুল
ক্ষীরের পুতুল ভিসিডি সহ
নালক
বুড়ো আংলা
ভূতপত্‌রীর দেশে
রাজকাহিনী
শকুন্তলা
হাওয়াবদল ও অন্যান্য রচনা

মনের কথা

যে-খাতার সঙ্গে ভাব হলো না, তার পাতায় ভালো লেখাও চললো না। এই খাতাটা অনেকদিন কাছে-কাছে রয়েছে, ভাব হয়ে গেলো এটার সঙ্গে। ভাব হলো যে-মানুষের সঙ্গে কেবল তাকেই বলা চললো নিজের কথা সুখ-দুঃখের। আমার ভাব ছোটোদের সঙ্গে—তাদেরই দিলেম এই লেখা খাতা। আর যারা কিনে নিতে চায় পয়সা দিয়ে আমার জীবন-ভরা সুখ-দুঃখের কাহিনী, এবং সেটা ছাপিয়ে নিজেরাও কিছু সংস্থান করে নিতে চায় তাদের আমি দূর থেকে নমস্কার দিচ্ছি। যারা কেবল শুনতে চায় আপন কথা, থেকে থেকে যারা কাছে এসে বলে 'গল্প বলো', সেই শিশু-জগতের সত্যিকার রাজা-রানী বাদশা-বেগম তাদেরই জন্যে আমার এই লেখা পাতা ক'খানা। শিশু-সাহিত্য-সম্রাট যাঁরা এসেছেন এবং আসছেন তাঁদের জন্যে রইলো বাঁহাতে সেলাম; আর ডান হাতের কুর্নিশ রইলো তাদেরই জন্যে যারা বসে শোনে গল্প রাজা-বাদশার মতো, কিন্তু ছেঁড়া মাদুর নয়তো মাটিতে বসে; আর গল্পের মাঝে মাঝে থেকে থেকে যারা বকশিশ দিয়ে চলে একটু হাসি কিংবা একটু কান্না; মান-পত্রও নয়, সোনার পদকও নয়; হয় একটু দীর্ঘশ্বাস, নয় একটুখানি ঘুমে-ঢোলা চোখের চাহনি! ঐ তারা—যারা আমার মনের সিংহাসন আলো করে এসে বসে, তাদেরই আদাব দিয়ে বলি, গরীব পরবৎ সেলামৎ—অব্ আগাজ্ কিস্‌সেকা করতা হুঁ, জেরা কান দিয়ে কর্ শুনো!

ছাপা হবে হয়তো বইখানা। একদিন কোনো বেরসিক অল্প দামে কিনে নেবে আমার সারা-জীবন খুঁজে খুঁজে পাওয়া যা কিছু সংগ্রহ। এইটে মনে পড়ে যখন, তখন হাসি পায়। বলি, এ কি হয় কখনো? সব কথা কি কেউ জানতে পারে, না জানাতেই পারে কোনো কালে? অনেক কথা রয়ে যাবে, অনেক রইবে না, এই হবে, তার বেশি নয়।

একটা শোনা-কথা বলি। তখন বাড়িতে প্ল্যানচিট্ চালিয়ে ভূত নামানো চলছে। দাদামশায়ের পার্ষদ দীননাথ ঘোষাল প্ল্যানচিটে এসে হাজির। বড়ো জেঠামশায় তাঁকে জেরা শুরু করলেন—পরকালটা এবং পরকালটার বৃত্তান্ত শুনে নিতে চেয়ে। প্ল্যানচিটে উত্তর বার হলো—'যে কথা আমি মরে জেনেছি, সে কথা বেঁচে থেকে ফাঁকি দিয়ে জেনে নেবে এ হতেই পারে না।'

আমিও ঐ কথা বলি। অনেক ভুগে পাওয়া এ-সব কাহিনী, কিনতে গেলে ঠকতে হয়, বেচতে গেলে ঠকতে হয়!

বলে যাওয়া চলে কেবল তাদেরই কাছে নির্ভয়ে, মনের কথা বেচা-কেনার ধার ধারে না যারা, যাত্রা করে বেরিয়েছে যারা, কেউ হামাগুড়ি দিয়ে, কেউ কাঠের ঘোড়ায় চড়ে, নানা ভাবে নানা দিকে আলিবাবার গুহার সন্ধানে! ছোটো ছোটো হাতে ঠেলা দিয়ে যারা কপাট আগলে বসে আছে, যে-দৈত্য সেটাকে জাগিয়ে বলে,

'ওপুন চিসম্'—অর্থাৎ চশমা খোলো, গল্প বলো। যারা থেকে থেকে ছুটে এসে বলে—'এই নুড়ি ছোঁয়াও, দেখবে দাদামশায়, লোহার গায়ে ধরে যাবে সোনা!' কুড়িয়ে পাওয়া পুরনো পিদুম ঘষে ঘষে যারা খইয়ে ফেলে, অথচ ছাড়ে না কিছুতে সাত-রাজার-ধন মানিকের আশা।

পদ্মদাসী

রাতের অন্ধকারের মাঝে দাঁড়িয়ে সারি সারি পল্‌-তোলা থাম, এরি ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে আমাদের তেতলার উত্তর-পুব কোণের ছোটো ঘরটা; এক কোণে জ্বলছে মিটমিটে একটা তেলের সেজ। হিমের ভয়ে লাল খেরুয়ার পুরু পর্দা দিয়ে সম্পূর্ণ মোড়া ঘরের তিনটে জানলাই, ঘরজোড়া উঁচু একখানা খাট—তাতে সবুজ রঙের মোটা দিশি মশারি ফেলা রয়েছে। ঘরে ঢোকবার দরজাটা এত বড়ো যে, তার উপর দিকটাতে বাতির আলো পৌঁছতে পারেনি! এই দরজার এক পাশে একটা লোহার সিন্দুক, আর তারই ঠিক সামনে কোথা থেকে একটা কাঠের খোঁটা হঠাৎ মেঝে ফুঁড়ে হাত তিনেক উঠেই থমকে দাঁড়িয়ে গেছে তো দাঁড়িয়েই আছে। এই খোঁটা—ঘরের মধ্যে যার দাঁড়িয়ে থাকার কোনো কারণ ছিলো না—সেটাতে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে দেড়হাত প্রমাণ এক ছেলে!

খোঁটার মাথার কাছে এতটুকু কুলুঙ্গির মতো একটা চৌকো গর্ত, তারই মধ্যে উঁকি দিয়ে দেখবার ইচ্ছে হচ্ছে, কিন্তু নাগাল পাচ্ছিনে কুলুঙ্গিটার! আলোর কাছে বসে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি পদ্মদাসী মস্ত একটা রুপোর ঝিনুক আর গরম দুধের বাটি নিয়ে দুধ জুড়োতে বসে গেছে—তুলছে আর ঢালছে সে তপ্ত দুধ। দাসীর কালো হাত দুধ জুড়োবার ছন্দে উঠছে নামছে, নামছে উঠছে! চারদিক সুন্‌সান্‌, কেবলি দুধের ধারা পড়ার শব্দ শুনছি। আর দাসীর কালো হাতের ওঠা-পড়ার দিকে চেয়ে একটা কথা ভাবছি—উঁচু খাটে উঠতে পারা যাবে কিনা! পর্দার ওপারে অনেক দূরে আস্তাবলের ফটকের কাছে নন্দ ফরাশের ঘর, সেখানে নোটো খোঁড়া বেহালাতে গৎ ধরেছে—এক দুই তিন চার, এহেক দুহি তিহিন চার। এক দুই তিন চার জানিয়ে দিলে রাত কতো হয়েছে তা—অমনি তাড়াতাড়ি খানিক আধ-ঠাণ্ডা দুধ কোনোরকমে আমাকে গিলিয়ে খাটের উপর তিনটে বালিশের মাঝখানটায় কাত করে ফেলে মনে মনে একটা ঘুম পাড়ানো ছড়া আউড়ে চললো আমার দাসী। আর তারই তালে তালে তার কালো হাতের রহে-রহে ছোঁয়া ঘুমের তলায় আস্তে আস্তে আমাকে নামিয়ে দিতে থাকলো!

একেবারে রাতের অন্ধকারের মতো কালো ছিলো আমার দাসী—সে কাছে বসেই ঘুম পাড়াতো কিন্তু অন্ধকারে মিলিয়ে থাকতো সে। দেখতে পেতেম না তাকে, শুধু ছোঁয়া পেতেম থেকে থেকে! কোনো-কোনো দিন অনেক রাতে সে জেগে বসে চালভাজা কট্‌কট্‌ চিবোতো, আর তালপাতার পাখা নিয়ে মশা তাড়াতো। শুধু শব্দে জানতেম এটা। আমি জেগে আছি জানলে দাসী চুপিচুপি মশারি তুলে একটুখানি নারকেল-নাড়ু অন্ধকারেই মুখে গুঁজে দিতো—নিত্য খোরাকের উপরি-পাওনা ছিলো এই নাড়ু!

খাটে উঠবো কেমন করে এই ভয় হয়েছিলো। কাজেই বোধ হচ্ছে উঁচু পালঙ্কে শোয়া সেই আমার প্রথম। জানিনে তার আগে কোথায় কোন ঘরে আমাকে নিয়ে শুইয়ে দিতো কোন বিছানায় সে?

চারদিকে সবুজ মশারির আবছায়া-ঘেরা মস্ত বিছানাটা ভারি নতুন ঠেকেছিলো সেদিন। একটা যেন কোনো দেশে এসেছি—সেখানে বালিশগুলোকে দেখাচ্ছে যেন পাহাড়-পর্বত, মশারিটা যেন সবুজ-কুয়াশা-ঢাকা আকাশ যার ওপারে—এখানে আর মনে করতে হতো না, দেখতে পেতেম চিৎপুর রাস্তা থেকে যে সরু গলিটা আমাদের ফটকে এসে ঢুকেছে সেটা একেবারে জনশূন্য! দু'নম্বর বাড়ির গায়ে তখনকার মিউনিসিপালিটির দেওয়া একটা মিট্‌মিটে তেলের বাতি জ্বলছে, আর সেই আলো-আঁধারে পুরনো শিব মন্দিরটার দরজার সামনে দিয়ে একটা কন্ধ-কাটা দুই হাত মেলে শিকার খুঁজে খুঁজে চলেছে! কন্ধ-কাটার বাসাটাও সেই সঙ্গে দেখা দিতো—একটা মাটির নল বেয়ে দু'নম্বর বাড়ির ময়লা জল পড়ে পড়ে খানিকটা দেওয়াল সোঁতা আর কালো, ঠিক তারই কাছে আধখানা ভাঙা কপাট চাপানো আড়াই হাত একটা ফোকরে তার বাস—দিনেও তার মধ্যে অন্ধকার জমা হয়ে থাকে!

সব ভূতের মধ্যে ভীষণ ছিলো এই কন্ধকাটা, যার পেটটা থেকে থেকে অন্ধকারে হাঁ করে আর ঢোক গেলে; যার চোখ নেই অথচ মস্ত কাঁকড়ার দাঁড়ার মতো হাত দুটো যার পরিষ্কার দেখতে পায় শিকার! আর একটা ভয় আসতো সময়ে সময়ে, কিন্তু আসতো সে অকাতর ঘুমের মধ্যে—সে নামতো বিরাট একটা আগুনের ভাঁটার মতো বাড়ির ছাদ ফুঁড়ে আস্তে আস্তে আমার বুকের উপর! যেন আমাকে চেপে মারবে এই ভাব—নামছে তো নামছেই গোলাটা, আমার দিকে এগিয়ে আসার তার বিরাম নেই। কখনো আসতো সেটা এগিয়ে জ্বলন্ত একটা স্তনের মতো একেবারে আমার মুখের কাছাকাছি, ঝাঁজ লাগতো মুখে চোখে! তারপর আস্তে আস্তে উঠে যেতো গোলাটা আমাকে ছেড়ে, হাঁফ ছেড়ে চেয়ে দেখতেম সকাল হয়েছে—কপাল গরম, জ্বর এসে গেছে আমার। দশ-বারো বছর পর্যন্ত এই উপগ্রহটা জ্বরের অগ্রদূত হয়ে এসে আমায় অসুস্থ করে যেতো। উপগ্রহকে ঠেকাবার উপায় ছিলো না কোনো, কিন্তু উপদেবতা আর কন্ধকাটার হাত থেকে বাঁচবার উপায় আবিষ্কার করে নিয়েছিলেম। লাল শালুর লেপ, তারই উপরে মোড়া থাকতো পাতলা ওয়াড়, আমি তারই মধ্যে এক-একদিন লুকিয়ে পড়তাম এমন যে, দাসী সকালে বিছানায় আমায় না দেখে—'ছেলে কোথা গো' বলে শোরগোল বাধিয়ে দিতো। শেষে পদ্মদাসীর পদ্মহস্তের গোটা কয়েক চাপড় খেয়ে যাদুকরের থলি থেকে গোলার মতো ছিটকে বার হতেম আমি সকালের আলোতে!

জীবনের প্রথম অংশটায় সকালের লেপের ওয়াড়খানা গুটি পোকার খোলসের মতো করে ছেড়ে বার হওয়া আর রাতে আবার গিয়ে লুকোনো লেপের তলায়, আর তারই সঙ্গে জড়িয়ে বাটি, ঝিনুক, খাট, সিন্দুক, তেলের সেজ, পদ্মদাসী, এমনি গোটাকতক জিনিস, আর শীতের রাতের অন্ধকারে কতকগুলো ভূতের চেহারা, দিনের বেলাতেও অন্ধকারে ঢিল ফেলার মতো কতকগুলো চমকে দেওয়া শব্দ—দরজার কড়ার শব্দ, চাবি-গোছার ঝিন্ ঝিন্ মাত্র আছে আমার কাছে, আর কিছু নেই—কেউ নেই!

১৮৭১ খ্রীষ্টাব্দের জন্মাষ্টমীর দিনে বেলা ১২টা ১১ মিনিট থেকে আরম্ভ করে খানিকটা বয়স পর্যন্ত রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শের পুঁজি—এক দাসী, একখানি ঘর, একটি খাট, একটি দুধের বাটি, এমনি গোটাকতক সামান্য জিনিসের মধ্যেই বদ্ধ রয়েছে। শোওয়া আর খাওয়া এ-ছাড়া আর কোনো ঘটনার সঙ্গে যোগ নেই আমার! অকস্মাৎ একদিন এক ঘটনার সামনে পড়ে গেলেম একলা। ঘটনার প্রথম ঢেউয়ের ধাক্কা সেটা। তখন সকাল দেড় প্রহর হবে, তিনতলার বড়ো সিঁড়ির উপর ধাপের কিনারা—যেখানটায় খাঁচার গরাদের মতো শিক দিয়ে বন্ধ করা—সেইখানটায় দাঁড়িয়ে দেখছি কাঠের সিঁড়ির প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ধাপগুলো একটা চৌকোনা যেন

কুয়োকে ঘিরে ঘিরে নেমে গেছে কোন পাতালে তার ঠিক নেই! এই ধাপে ধাপে ঘূর্ণির মাঝে একটা বড়ো চাতাল। পশ্চিম দিকের একটা খোলা ঘর হয়ে চাতালের উপরটায় এসে পড়েছে চওড়া শাদা আলোর একটি মাত্র টান। ঠিক এইখানটায় আমার কালোদাসী আর 'রসো' বলে একটা মোটাসোটা ফরশা চাকরানী কথা কইছে শুনছি। আমি তো তাদের কথা বুঝিনে—কথার মানেও বুঝিনে—কেবল স্বরের ঝোঁক আর হাত-পা নাড়া দেখে জানছি দাসীতে দাসীতে ঝগড়া বেধেছে। খাঁচার পাখির মতো গরাদের মধ্যে থেকে বাইরে চেয়ে দেখছি কি হয়। হঠাৎ দেখলেম আমার দাসী একটা ধাক্কা খেয়ে ঠিকরে পড়লো দেওয়ালের উপর। আবার তখনি সে ফিরে দাঁড়িয়ে আঁচলটা কোমরে জড়াতে থাকলো। তখন তার কালো কপাল বেয়ে রক্ত পড়ছে, চুলগুলো উস্‌কো—চেহারা রাগে ভীষণ হয়ে উঠেছে; সিঁদুর-পরা যেন কালো পাথরের ভৈরবী মূর্তি সে একটি! আমি চিৎকার করে উঠলেম—'মারলে, আমার দাসীকে মারলে!' লোকজন ছুটে এলো, ডাক্তার এলো, একটা ছেঁড়া-কাপড়ের শাদা পটি দাসীর কপালে বেঁধে দিয়ে গেলো; কিন্তু আমার মনে জেগে রইলো সিঁড়ির ধারে সকালের দেখা রক্তমাখা কালো রূপটাই দাসীর! সেই আমার শেষ দেখা দাসীর সঙ্গে। তারপর থেকে দেখি দাসী কাছে নেই কিন্তু তার ভাবনা রয়েছে মনে—দেশ থেকে খেলনা নিয়ে ফিরবে দাসী। সিঁড়ির দরজায় বসে বীরভূমের গালার তৈরি একটা কাছিম নিয়ে খেলি আর রোজই ভাবি দাসী আসবে! কোন গাঁয়ের কোন ঘর ছেড়ে এসেছিলো অন্ধকারের মতো কালো আমার পদ্মদাসী! শুনি সে ভীষণ কালো ছিলো। পদ্ম নামটা মোটেই তাকে মানাতো না। সে তার বেমানান নাম নিয়েই এসেছিলো এ-বাড়িতে। রাগ করে গেছে; গল্প বলেছে, ঝগড়া করেছে, কাজও করছে এবং মানুষ করবার বকশিশ সোনার বিছেহার আর রক্তের টিপ পরে চলেও গেছে বহুদিন। পৃথিবীর কোনোখানে হয়তো আর কোনো মনে ধরা নেই তার কিছুই এক আমার কাছে ছাড়া। হয়তো বা তাই আপনার কথা বলতে গিয়ে সেই নিতান্ত পর এবং একান্ত দূর যে তাকেই দেখতে পাচ্ছি—পঞ্চান্ন বছরের ওধারে বসে সে দুধ ঢালছে আর তুলছে আমার জন্যে!···

আমার কুষ্ঠিখানা লিখেছে দেখি বেশ গুছিয়ে সন তারিখ বছর মাস মিলিয়ে। পরে পরে ঘটনাগুলো ধরে দিয়েছে সেখানে গণৎকার। কিন্তু এ-ভাবে জীবনটা তো আমার চললো না লতার পর লতা পারম্পর্য ধরে। কাজেই কুষ্ঠি অনেকটা ফলে গেলেও আমাদের সেকালের 'কালী আচিয্যি'কে দ্বিতীয় বিধাতা-পুরুষ বলে স্বীকার করা চললো না। আচমকা যে-সব ঘটনার সঙ্গে পরিচয় হয়ে পড়ে আজও সেইগুলোকেই আমি জানি বিধাতার সাটে লেখা বলে—যেটা তিনি ছ'দিনের দিন সব ছেলেরই একটুখানি মাথার খুলিতে ঘুণাক্ষরের চেয়েও অপাঠ্য অক্ষরে লিখে যান। ঘটনা ঘটলো তো জানলেম কপালে এইভাবে এটা লেখা ছিলো।

একটা বিস্ময়-চিহ্ন কালো কালিতে, তার মাথায় লাল কালির একটা টান—এই সাটটুকুর মধ্যেই ধরা গিয়েছিলো আমার আর দাসীর আদ্যন্ত ইতিহাস। তারপর হয়তো খানিকটা ফাঁকা মাথার খুলি; তারপর আর একটা অদ্ভুত চিহ্ন, ঘটাকার কি পটাকার, কি একটা পাখি, কি একটা বাঁদর, কি একটা গোলাকার, কত কী যে তার শেষ নেই—সেঁজুতি ব্রতের আলপনার মতো বিধাতার জল্পনা-কল্পনা জানাতে রইলো। জন্ম থেকে আরম্ভ করে প্রথম বিস্ময়ের চিহ্নটাতে এসে আমার পনেরো মাস কি পঁচিশ মাস কি কতোটা বয়স কেটেছিল তা বলতে পারা শক্ত; তবে হঠাৎ অসময়ে এসে যে চিহ্নটাতে কপাল ঠুকেছিলেম আমি এবং আমার দাসী দু'জনেই—এটা ঠিক!

সাইক্লোন

এটা জানি তখন—দিন আছে, রাত আছে, আর তারা দু'জনে একসঙ্গে আসে না আমাদের তিনতলায়। এও জেনেছি, বাতাস একজন ঠাণ্ডা, একজন গরম; কিন্তু তাদের দু'জনের কারো একটা করে ছাতা নেই গোলপাতার। রোদে পোড়ে, বিষ্টিতে ভেজে ওদের গা। এও জেনে নিয়েছি যে একটা একটা সময় অনেকজন রোদ বাইরে থেকে ঘরে এসেই জানলাগুলোর কাছে একটা একটা মাদুর বিছিয়ে রোদ পোহাতে বসে যায়।

কোনোদিন বা রোদ একজন হঠাৎ আসে খোলা জানলা দিয়ে সক্কালেই। তক্তপোশের কোণে বসে থাকে সে, মানুষ বিছানা ছেড়ে গেলেই তাড়াতাড়ি রোদটা গড়িয়ে নেয় বালিশে তোশকে চাদরে আমার খাটেই। তারপর চট্ করে রোদ ধরা পড়ার ভয়ে বিছানা ছেড়ে দেয়াল বেয়ে উঠে পড়ে কড়িকাঠে। ছাতের কাছেই আল্সের কোণে দুটো নীল পায়রা থাকে জানি, আলো হলেই তারা দু'জনে পড়া মুখস্থ করে—পাক্পাখম্—মেজদি··· সেজদি···

কড়ে আঙুল বলে খাবো; আংটির আঙুল বলে কোথায় পাবো; মাঝের আঙুল বলে ধার করোগে; আর একটা আঙুল, তার নাম যে তর্জনী, তা জানিনে, কিন্তু সে বলে জানি, শুধবো কিসে; বুড়ো আঙুল বলে লবডংকা। কি সেটা, দেখতে লঙ্কার মতো আর খেতে ঝাল না মিষ্টি তা জানিনে, কিন্তু খুব চেঁচিয়ে কথাটা বলে মজা পাই।

বন্ধ খড়খড়ির একটু ফাঁক পেয়ে জানি রাত আসে এক-একদিন, শাদা প্রজাপতির মতো এক ফোঁটা আলো, মাথার বালিশে ডানা বন্ধ করে ঘুমোয় সে, হাত চাপা দিলে হাতের তলা থেকে হাতের উপরে-উপরে চলাচলি করে। এমন চটুল এমন ছোটো যে, বালিশ চাপা দিলেও ধরে রাখা যায় না; বালিশের উপরে চট করে উঠে আসে। চিৎ হয়ে তার উপর শুয়ে পড়ি তো দেখি পিঠ ফুঁড়ে এসে বসেছে আমারই নাকের ডগায়। উপুড় হয়ে চেপে পড়লেই মুশকিল বাধে তার—ধরা পড়ে যায় একেবারে, ঐটা নিশ্চয় করে জেনেছি তখন।

পড়তে শেখার আগেই, দেখতে শুনতে চলতে বলতে শেখারও আগে, ছেলেমেয়েদের গ্রহ-নক্ষত্র, জল-স্থল, জন্তু-জানোয়ার, আকাশ-বাতাস, গাছপালা, দেশবিদেশের কথা বেশ করে জানিয়ে দেবার জন্যে বইগুলো তখন ছিলোই না। বই লিখিয়েও ছিলো না হয়তো, কাজেই খানিক জানি তখন নিজে নিজে, দেখে কতক, ঠেকে কতক, শুনে কতক, ভেবে ভেবেও বা কতক। আমি দিচ্ছি পরীক্ষা তখন আমারই কাছে, কাজেই পাশই হয়ে চলেছি জানা-শোনার পরীক্ষাতে। আমাদের শান্তিনিকেতনের জগদানন্দবাবুর 'পোকা-মাকড়' বই কোথায় তখন, কিন্তু মাকড়সার জালশুদ্ধ মাকড়সাকে আমি দেখে নিয়েছি। আর জেনে ফেলেছি যে, মাকড় মরে গেলে বোকড় হয়ে খাটের তলায় কম্বল বোনে রাতের বেলা। 'মাছের কথা' পড়া দূরে থাক, মাছ খাবারই উপায় নেই

তখন, কাঁটা বেছে দিলেও। কিন্তু এটা জেনেছি যে, ইলিশ মাছের পেটে এক থলিতে থাকে একটু সতীর কয়লা, অন্য থলি ক'টাতে থাকে ঘোড়ার ক্ষুর, বামুনের পৈতে, টিক্‌টিকির লেজ এমনি নানা সব খারাপ জিনিস যা মাছ-কোটার বেলায় বার করে না ফেললে খাবার পরে মাছটা মুশকিল বাধায় পেটে গিয়ে। জেনেছি সব রুই মাছগুলোই পেটের ভিতরে একটা করে ভুঁই-পটকা লুকিয়ে রাখে। জলে থাকে বলে পটকাগুলো ফাটাতে পারে না; ডাঙায় এলেই তারা মরে যায় বলে পটকাও ফাটাতে পারে না নিজেরা। সে-জন্যে মাছের দুঃখ থাকে, আর এইজন্যেই মাছ-কোটার বেলায় আগে-ভাগে পটকাটা মাটিতে ফাটিয়ে দিতে হয়। না হলে মাছ রাগ করে ভাজা হতে চায় না, দুঃখে পোড়ে, নয়তো গলায় গিয়ে কাঁটা বেঁধায় হঠাৎ।

কালোজামের বিচি পেটে গেলেই সর্বনাশ, মাথা ফুঁড়ে মস্ত জামগাছ বেরিয়ে পড়ে। আর কাগ এসে চোখ দুটোকে কালোজাম ভেবে ঠুকরে খায়। জোনাকি—সে আলো খুঁজতে পিদুমের কাছে এলো তো জানি লক্ষণ খারাপ, তখন 'তারা' 'তারা' না স্মরণ করলে ঘরের দোষ কিছুতেই কাটে না।

বটতলার ছাপা 'হাজার জিনিস' বইখানার চেয়েও মজার একখানা বই—তারই পাণ্ডুলিপির মাল-মশলা সংগ্রহ করে চলেছে বয়েসটা আমার তখন। বড়ো হয়ে ছাপাবার মতলবে কিংবা সর্ট-হ্যাণ্ড রিপোর্টের মতো ছাঁট অক্ষরে সাটে টুকে নিচ্ছে সব কথা—এ মনেই হয় না। আজও যেমন বোধকরি—যা কিছু সবই—এরা আমাকে আপনা হতে এসে দেখা দিচ্ছে—ধরা দিচ্ছে এসে এরা। খেলতে আসার মতো এসেছে, নিজে থেকে তাদের খুঁজতে যাচ্ছিনে—নিজের ইচ্ছামতো তারাই এসে চোখে পড়ছে আমার, যথাভিরুচি রূপ দেখিয়ে পালিয়ে যাচ্ছে খেলুড়ির মতো খেলা শেষে। সে পঞ্চাশ বছর আগে তখনো তেমনি বোধ হতো। দেখছি না আমি, কিন্তু দেখা দিচ্ছে আমাকে সবাই; আর এই করেই জেনে চলেছি তাদের নির্ভুল ভাবে। রোদ, বাতাস, ঘর, বাড়ি, ফুল, পাতা, পাখি এরা সবই তখন কি ভুল বোঝাতেই চললো অথবা স্বরূপটা লুকিয়ে মন-ভোলানো বেশে এসে সত্যি পরিচয় ধরে দিয়ে গেলো আমাকে, তা কে ঠিক করে বলে দেয়?

এ-বাড়িটা তখন আমায় জানিয়েছে—মাত্র তেতলা সে। তেতলার নিচে যে আরেকটা তলা আছে, দোতলা বলে যাকে, এবং তারও নিচে একতলা বলে আর একটা তলও আছে—এ-কথা জানতেই দেয়নি বাড়িটা। কিন্তু সে জলে না হাওয়ায় ভাসছে এ মিছে কথাটাও তো বলেনি বাড়িটা। অসত্য রূপটাও তো দেখা যায়নি। আপনার খানিকটা রেখেছিলো বাড়ি আড়ালে, খানিকটা দেখতে দিয়েছিলো, তাও এমন একটি চমৎকার দেখা এবং না-দেখার মধ্য দিয়ে যে তেমন করে সারা বাড়ির ছবি ধরে, কিংবা ইঞ্জিনিয়ারের প্ল্যান ধরে, অথবা আজকের দিনে সারা বাড়িখানা ঘুরে ঘুরেও দেখা সম্ভব হয় না। আজকের দেখা এই বাড়ি সে একটা স্বতন্ত্র বাড়ি বলে ঠেকে, যেটা সত্যিই আমাকে দেখা দেয়নি। কিন্তু সেদিনের সে একতলা দোতলা নেই, এমন যে তিনতলা, সে এখনও তেমনিই রয়েছে আমার কাছে। নিজে থেকে জানাশোনা দেখা ও পরিচয় করে নেওয়া আমার ধাতে সয় না। কেউ এসে দেখা দিলে, জানান দিলে তো হলো ভাব; কেউ কিছু দিয়ে গেলো তো পেয়ে গেলাম। পড়ে পাওয়ার আদর বেশি আমার কাছে; কুড়িয়ে পাওয়ার নুড়ির মূল্য আছে আমার কাছে; কিন্তু খেটে পাওয়া পাঁঠার মুড়ির দিকে টান নেই আমার। হঠাৎ খাটুনি জুটে গেলে মজা পাই, কিন্তু 'হঠাৎ' সত্যি 'হঠাৎ' হওয়া চাই, না-হলে নকল 'হঠাৎ' কোনোদিনই মজা দেয় না, দেয়নিও আমাকে। আমি যদি সাহেব হতেম তো অবিবাহিতই থাকতে হতো, কোর্টশিপটা আমার দ্বারা হতোই না। দাসীটা চলে গেলো তার যে-টুকু

ধরে দেবার ছিলো দিয়ে হঠাৎ। এমনি হঠাৎ একদিন উত্তর-পুব কোণের ঘরটাও যা-কিছু দেখবার ছিলো দেখিয়ে যেন সরে গেলো আমার কাছ থেকে।

মনে আছে এক অবস্থায় শীত গ্রীষ্ম বর্ষা কিছুই নেই আমার কাছে। সেই সময়টাতে ছোটো ঘরে হঠাৎ একদিন সকালে জেগেই দেখলেম—লেপের মধ্যে থাকতে থাকতে, কোন এক সময় শীতকাল গিয়ে গরম কাল এলো। আজ সকালে আমার কপালটায় ঘাম দিয়েছে, আজই দাসী বিছানার তলায় লেপটিকে তাড়িয়ে দেবে, আজ রাতে খোলা জানলায় দেখা যাবে নীল আকাশ আর থেকে থেকে তারা, আর আমাকে একটা শাদা জামার উপরে আর একটা সুতোর কাপড়ের ঠিক তেমনিজামা পরে নিতে হবে না, সক্কাল থেকে মোজা পায়ে দিয়েও কর্মভোগে ভুগতে হবে না জেনে ফেললেম হঠাৎ।

সেই ছেলেবেলা থেকে আজ পর্যন্ত না-জানা থেকে জানার সীমাতে পৌঁছনোর বেলা একটা কোনো নির্দিষ্ট ধারা ধরে অঙ্কের যোগ বিয়োগ ভাগফলটার মতো এসে গেলো জগৎ-সংসারের যা-কিছু, তা হলো না তো আমার বেলায়। কিংবা ঘটা করে আগে থাকতে জানান দিয়ে ঘটলো ঘটনা সমস্ত তাও নয়। হঠাৎ এসে বললে তারা বিস্ময়ের পর বিস্ময় জাগিয়ে—'আমি এসে গেছি!' ঠিক যেমন ছবি এসে বলে আজও হঠাৎ—'আমি এসে গেলেম, এঁকে নাও চটপট।' যেমন লেখা বলে—'হয়ে গেছি তৈরি চালিয়ে চলো কলম।' চম্‌কি দেবী বলে নিশ্চয় জানি কেউ আছেন আর কাজই যাঁর গোড়া থেকেই চমক ভাঙিয়ে দেওয়া। দেখার পুঁজি জানার সম্বল তিল তিল খুঁটে ভরে তুলতে কতো দেরি লাগতো যদি চম্‌কি না থাকতেন সঙ্গে দাসীটা ছেড়ে যাবার পরেও। কিণ্ডারগার্টেন স্কুলের ছাত্রের মতো স্টেপ বাই স্টেপ পড়তে পড়তে চলতে দিলেন না দেবী আমাকে, হঠাৎ পড়া হঠাৎ না-পড়া দিয়ে শুরু করলেন শিক্ষা তিনি।

বাড়ির অলিগলি আপন-পর সব চেনা হয়ে গেছে, বাড়ির বাইরেটাকেও জেনে নিয়েছি। কাকের বুলি, কোকিলের ডাক ভিন্নতা জানিয়ে দিয়েছে আপনাদের। গরু-গাধাতে, মানুষে-বানরে, ঘোড়াতে আর ঘোড়ার গাড়িতে মিল অমিল কোনখানে বুঝে নিয়েছি। বাড়ির চাকর-চাকরানী তাদের কার কি কাজ; কার মনিব কে-বা—সবই জানা হয়ে গেছে। বুঝেও নিয়েছি আমি এ-বাড়ির একজন। কিন্তু কি নাম আমার সেটা বলার বেলায় হাঁ করে থাকি বোকার মতো—অথচ থামকে বলি থামই, ছাতকে ছাতা বলে ভুল করিনে; পুকুরকে জানি পুকুর, আর তার জলে পড়লে হাবুডুবু খেয়ে মরতে হয় তাও জানি। চলি চলি পা নেই—বড়ো বড়ো সিঁড়ির চার-পাঁচ ধাপ লাফিয়ে পড়ি। জেনেছি কাঁচা পেয়ারা লুন দিয়ে খেতে লাগে ভালো; ডাক্তারের রেড মিক্‌শ্চার চিংড়ি মাছের ঘী নয়, কিন্তু বিস্বাদ বিশ্রী জিনিস। দুধের সর ভালোবাসি কিন্তু দাসীরা কেউ সেটাতে এক-একদিন ভাগ বসায় তো ধরে ফেলি।

কেবল একটা কথা থেকে থেকে ভুলতে পারিনে—আমি ছোটো ছেলে। অনেকদিন লাগছে, বড়ো হতে, গোঁপদাড়ি উঠতে, ইচ্ছামতো নির্ভয়ে পুকুরের এপার-ওপার করতে, চৌতলার ছাতে উঠে ঘুড়ি ওড়াতে এবং তামাক খেতে, বিষ্টিতে ভিজতে।

বাড়ির চাকরগুলো স্বাধীনভাবে রোদ পোহায়, বিষ্টিতে ভেজে, ছোলাভাজা খায়। পুকুরে নামে ওঠে, তামুক খায়, ফটকের বাইরে চলে যায় গোল-পাতার ছাতা ঘাড়ে হাঁটতে হাঁটতে—এ-সব কেবলি মনে পড়ায় বড়ো হইনি, ছোটোই আছি—বুঝি বা এমনই থাকবো চিরদিন তেতলায় ধরা। সেই সময় সেই বহুকাল আগের একটা ঝড় পাঠালেন আমাকে দেখতে চম্‌কি দেবী। ঝড়টা এসেছিলো রাতের বেলায় এ-টুকু মনে আছে,

তাছাড়া ঝড় আসার পূর্বের ঘটনা, ঘনঘটা, বজ্রবিদুৎ, বৃষ্টি, বন্ধ-ঘর, অন্ধকার কি আলো কিছুই মনে নেই। ঘুমিয়ে পড়েছি, তখন উঠলো তেতলায় ঝড়। কেবলি শব্দ, কেবলি শব্দ। বাতাস ডাকে, দরজা পড়ে; সিঁড়িতে ছুটোছুটি পায়ের শব্দ ওঠে দাসী চাকরদের। হঠাৎ দেখেও ফেললেম চিনেও ফেললেম—দুই পিশিমা, দুই পিশেমশায়, বাবামশায়, আর মাকে, যেন প্রথম সেইবার। তিনতলায় এ-ঘর ও-ঘর সে-ঘর সবক'টা ঘরই যেন ছুটোছুটি করে এসে একসঙ্গে একবার আমাকে দেখা দিয়েই পালিয়ে গেলো।

এর পরেই দেখছি, বড়ো সিঁড়ির মাঝে একেবারে চৌতলার ছাত থেকে মোটা একগাছা শিকলে বাঁধা লোহার গির্জার চূড়োর মতো সেকেলে পুরনো লণ্ঠনটাকে নিয়ে শিকলশুদ্ধ বিষম দোলা দিচ্ছে ঝড়। নন্দ ফরাশ—আমাদের লণ্ঠনটাকেই ভালোবাসে সে, সরু একগাছা শনের দড়া দিয়ে কোনোরকমে শিকল-সমেত লণ্ঠনটাকে টেনে বেঁধে ফেলতে চাচ্ছে সিঁড়ির কাটরায়। তুফানে পড়লে বজরাকে যে-ভাবে মাঝি চায় ডাঙ্গায় আটকে ফেলতে, ঠিক তেমনি ভাবটা তার।

কোনদিন এর আগে জানিয়েছিল শিকলি, লণ্ঠন, সিঁড়ি ও ফরাশ আপন-আপন কথা আমাকে তা একটুও মনে নেই, কিন্তু এটা বেশ মনে হচ্ছে সেই প্রথম গিয়ে পড়লেম দোতলায়, বৈঠকখানার মাঝের ঘরটাতে। কে যে আমাকে নামিয়ে আনলে, হাত ধরে টেনে হিঁচড়ে আনলে, কিংবা কোলে করে নামিয়ে আনলে তা মনে নেই। কেবল মাঝের ঘরটা মনে আছে। সেখানে সারি সারি বিছানা, কৌচ টেবিল সরিয়ে, মাদুরের উপর পেতে দিতে ব্যস্ত দাসীরা। হলদে রঙের বড়ো বড়ো কাঠের দরজা সারিসারি সবক'টাই বন্ধ হয়ে গেছে। ঘরে বাতাস আসতে পারছে না, চাকরানীগুলো দুধের বাটি, জলের ঘটি, পানের বাটা, পিতলের ডাবর ঝন্‌ঝন্ করে ফেলে ফেলে মজা করছে ঘরের কোণে। এরই মাঝে মাদুরে বসে দেখছি: মাথার উপরে শাদা কাপড়ের গোলাপমোড়া একটার পর একটা বড়ো ঝাড়, দেয়ালে দেয়ালে দেয়ালগিরি, ছোটো বড়ো সব অয়েলপেন্‌টিং বাড়ির লোকের। জানছি ঝড় যেন একটা কী জানোয়ার—গর্জন করে ফিরছে বন্ধ বাড়ির চারদিকে! দরজাগুলোও ধাক্কা দিয়ে কেবলি পথ চাচ্ছে ঘরে ঢোকবার।

এক সময়ে হুকুম হলো ছেলেদের শুইয়ে দেবার। দক্ষিণ শিয়রে মায়ের কাছে সেদিন মেঝেতে পাতা শক্ত বিছানায় মুড়ি দিয়ে শুয়ে নিলেম, কিন্তু ঘুমিয়ে গেলেম না। অনেক রাত পর্যন্ত শুনতে থাকলেম—বাতাস ডাকছে, বৃষ্টি পড়ছে, আর দুই পিশি পান-দোক্তা খেয়ে বলাবলি করছেন এমনি আর একটা আশ্বিনের ঝড়ের কথা।

সেই রাতে একটা ইংরিজি কথা জানলেম—'সাইক্লোন'। ঝড়ের এক ধাক্কায় যেন বাড়ির অনেকখানি, বাড়ির মানুষদের অনেকখানি, সেই সঙ্গে ঝড়ই বা কি, সাইক্লোনই বা কাকে বলে জানা হয়ে গেলো। এক রাত্তিরে যেন মনে হলো অনেকখানি বড়ো হয়ে গেছি, জেনেও ফেলেছি অনেকটা—ঘরকে, বাইরেকেও।

উত্তরের ঘর

বাড়ির দক্ষিণ জুড়ে ফুলবাগান, পুকুর, গাছপালা, মেহেদির বেড়া ঘেরা সবুজ চক্কর। সেদিকে প্রকৃতির সৌন্দর্য সুষমা ও কল্পনা। চাঁদ ওঠে সেদিকে, সূর্য ওঠে সেদিকে, মস্ত বটগাছের আড়াল দিয়ে।

পুকুরজলে দিনরাত পড়ে আলো-ছায়ার মায়া! দুপুরে ওড়ে প্রজাপতি, ঝোপে ডাকে ঘুঘু, আর কাঠ-ঠোকরা থেকে থেকে। ময়ূর বেড়ায় পাখনা মেলিয়ে, রাজহংস দেয় সাঁতার, ফোহারাতে জল ছোটে সকাল বিকেল। সারস ধরে নাচ বাদলার দিনে, ঝড় বাতাসে নারকেল গাছের সারি দোল খায়। গরমের দিনে দুপুরে চিল স্থির ডানা মেলিয়ে ভেসে ঝিম্ সুরে ডাক দিয়ে ঘুরে ঘুরে ক্রমেই ওঠে উপরে! পায়রা থেকে থেকে ঝাঁক বেঁধে বাড়ির ছাতে উড়ে উড়ে বেড়ায়। কাক উড়িয়ে নেয় শুকনো ডাল মাটি থেকে গাছের আগায়। সন্ধ্যায় ওঠে নীল আকাশের তারা। রাতে ডাকে পাপিয়া—কতোদূর থেকে কোকিল তার জবাব দেয়—পিউ পিউ, কিউ কিউ! আবার শেয়ালও ডাকে রাতে, ব্যাঙও বলে বর্ষায়। বেঁজিও বেরোয়, বেড়ালও বেরোয় থেকে থেকে শিকার সন্ধানে। একটা-একটা নেড়ি কুত্তো, সে-ও ফাঁক বুঝে হঠাৎ ঢোকে বাগানে, চারদিক দেখে নিয়ে চট করে সরেও পড়ে রবাহুত গোছের ভাব দেখিয়ে।

কিন্তু তখনো বাড়ির এই রমণীয় দিকটাতে নেমে যাবার আমার বয়েস হয়নি, উঁকি দেবারও অবস্থ হয়নি। ওদিকটা ছিলো সেকালের নিয়মে বারবাড়ির সামিল। অন্দরে যারা থাকতো তারা তেতলার টানা বারান্দার বন্ধ ঝিলমিল দিয়ে ওদিককার আভাস মাত্র পেতে পারতো। কি ছেলে, কি মেয়ে, কি দাসী, কি বৌ, কি গিন্নিবান্নি—সকলের পক্ষেই এই ছিলো ব্যবস্থা। বেশি রাত না হলে দক্ষিণের ঝিলমিল দেওয়া জানলা ক'টা পুরোপুরি খোলা ছিলো তখন বেদস্তুর। ঐ দিকটা বন্ধ রাখা প্রথা হয়ে গিয়েছিলো কতকটা দায়ে পড়েও। এ-বাড়িটা বৈঠকখানা হিসেবে প্রস্তুত করা—এটাকে আমাদের বসতবাড়ি হিসাবে করে নিতে এখানে ওখানে নানা পর্দা দিতে হয়েছে, না হলে ঘরের আব্রু থাকে না। বৈঠকখানায় বাস করতে হবে মেয়েছেলে নিয়ে, সেটা একটা দুর্ভাবনা জাগিয়েছিলো নিশ্চয়; তাই কতকগুলো পর্দা ঝিলমিল ও চলাফেরার নিয়ম দিয়ে বাড়ির কতক অংশ, পুরনো বাড়ি ছেড়ে উঠে আসার সঙ্গে সঙ্গেই, অন্দর হিসেবে দেওয়াল ঝিলমিল ইত্যাদি দিয়ে ঘিরে নিতে হয়েছিলো আব্রুর জন্যেও বটে, বাস-ঘরের অকুলানের জন্যেও বটে। এবং সেই পর্দা দেওয়াল ইত্যাদি ওঠার সঙ্গে কতকগুলি জানলা-বন্ধ দরজা-বন্ধ নিয়মও সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিলো আপনা হতেই। যখন আমি হয়েছি তখন বন্ধ থাকতো দক্ষিণের ঝিলমিল তিনতলার, ভোর হতে রাত দশটা নিয়মমতো। দক্ষিণ বারান্দার তিন হাত পাঁচিল, তার উপর রেমো সবুজ রঙ-মাখানো টানা ঝিলমিল বন্ধ। আর আমি তখন মোটে দুই হাত খাড়াই কিনা সন্দেহ। ড্রপ সিনের সবুজ পর্দার ওপারে কি আছে জানার জন্যে যেমন একটা কৌতূহল থাকে,

তেমনি বাড়ির মনোরম অংশটাকে দেখবার জন্যে একটা কৌতূহল ছিলো কি ছিলো না, কিন্তু উত্তর দিকটাতেই টানছে এখন মন—যে-দিকটাতে জীবন বিচিত্র হয়ে দেখা দেয় খিড়কির ফাঁকে ফাঁকে। এই খড়খড়ি দেওয়া বাইরের জগতের খিড়কি, এদিকে সকাল বিকেল, যখন তখন, বাড়ির সাধারণ দিক দেখে চলতেম। অষ্টপ্রহর কিছু-না-কিছু হচ্ছে সেখানে—চলছে, বলছে, উঠছে, বসছে; কতো চরিত্রের, কতো ঢঙের, কতো সাজের মানুষ, গাড়ি, ঘোড়া—কতো কি তার ঠিক নেই। মানুষ, জন্তু, কাজ-কর্ম এখানে সবই এক-একটা চরিত্র নিয়ে অবিশ্রান্ত চলন্ত ছবির মতো চোখের উপরে এসে পড়তো একটার ঘাড়ে আর একটা। সব ছবিগুলো নিজেতে নিজে সম্পূর্ণ—ছেদ নেই, ভেদ নেই, টানা চলেছে চোখের সামনে দিয়ে দৃশ্যের একটা অফুরন্ত স্রোত, ঘটনার বিচিত্র অশ্রান্ত লীলা। উত্তরের সারি সারি তিনটে জানলার তলাতে দেড় ফুট করে উঁচু সরু দাওয়া—সেইখানে বসে খড়খড়ি টেনে দেখি। পুরোপুরি একখানা ছবির মতো চোখে পড়তো না। বাড়ি, ঘর, গাছ—এরই নিচে একটা ময়লা সবুজ টান, তারপর আবার ছবি—ছাগল, মুরগী, হাঁস, খাটিয়া, বিচালির গাদা, খানিকটা চাকার-আঁচড় কাটা রাস্তা—তারপর আবার সবুজ টান। এমনি একটা করে খড়খড়ির ফাঁকে আর একটা করে কাঠের পাটা—এরই উপর সব ছবি ও না-ছবিকে দু'ভাগ করে একটা সরু দাঁড়ি—খবরের কাগজের দুটো কলমের মাঝের রেখার মতোই সোজা—যেটা টানলে হয় ছবি, চাপলে হয় বন্ধ ছবি দেখা।

বাড়ির উত্তর আঙ্গিনাটায় একটা গোল চক্কর ছিলো তখন—এখন সেখানে মস্ত লালবাড়ি উঠে গেছে। এই চক্করের পুব পাশে আর একটা আধা-গোল গোছের চক্কর; পশ্চিম পাশে আর একটা চৌকোনা পাঁচিল-ঘেরা বাগান। এই ক'টা ঘিরে আস্তাবল, নহবতখানা, গাড়িখানা। তিনটে বড়ো বড়ো বাদাম আর অনেক কালের পুরনো তেঁতুলগাছ একটা। এই গাছ ক'টার ফাঁকে ফাঁকে টানা উঁচুনিচু সব পাকাবাড়ির ছাত আর চিলে-কোঠা। সরু সরু কাঠের থাম দেওয়া, ঝুঁকে-পড়া বারান্দা দেওয়া রামচাঁদ মুখুজ্যের সাবেক বাড়ি—গরাদে আঁটা ছোটো ছোটো জানলা, ইঁট বার-করা ছাতের পাঁচিল আর দেওয়াল। উত্তরের এইটুকুর মধ্যে ধরা তখন বাইরের দৃশ্য-জগৎটি আমার, বাকি দিকগুলো শোনা আর কল্পনার মধ্যে ছিলো। বহির্জগতের খিড়কি দিয়ে, উঁকি দিয়ে দেখার মতো ছবিগুলো। মানুষ, মুরগি, হাঁস, গাড়িঘোড়া, সহিস, কোচম্যান, ছিরু মেথর, নন্দ ফরাশ, গোবিন্দ খোঁড়া, বুড়ো জমাদার, ভিস্তি, মুটে, উড়ে বেহারা, গোমস্তা, মুহুরি, চৌকিদার, ডাক-পেয়াদা—সবাইকে নিয়ে মস্ত একটা যাত্রা চলেছে এই উত্তরের আঙ্গিনাটায়। সকাল থেকে ঘুমের ঘড়ি না পড়া পর্যন্ত কতো কি মজার মজার ঘটনা ঘটে চলেছে দেখতেম এই দিকটাতে। কতক সুরকির রাস্তায়, কতক গোল চাকলার মধ্যেটায়, কতক বা খোলার ঘরগুলোর ভিতরে এবং বাইরে অথবা কোনো বাড়ির ছাতে অনেক দূরে। চলতি-ভাষায় যেন একটা চলনসই নাটক দেখছি। খুব বড়ো ট্রাজেডি কি কমেডি নয়, কিন্তু কতক নড়াচড়া, কতক হাবভাব, কতক বা একটা ছবি—এই দিয়ে ভরতি একটা প্রহসন দেখছি বলতে পারি। সকালে চোখ খোলা থেকে আরম্ভ করে রাত দশটায় চোখের পাতা বন্ধ করা পর্যন্ত একটা বড়ো নাটক দেখার মতো ছুটি নেই এখন, কিন্তু এটুকু অবসর পেয়েছিলেম তখন। নিত্য নতুন উত্তর চরিতের এক-এক অঙ্কের মতো—এই নাটক শুরু হতো এবং শেষ হতো যে-ভাবে তার একটু হিসেব দিই।

তখনও বাড়িতে জলের কল বসেনি। রাস্তার ধারে ধারে টানা নহর বয়ে কলের জল আসে। রোজই দেখি এক ভিস্তি, গায়ে তার হাত-কাটা নীলজামা, কোমরে খানিক লাল শালু জড়ানো, মাথায় পোস্ট অফিসের গম্বুজের মতো উঁচু শাদা টুপি—নহরের পাশে দাঁড়িয়ে চামড়ার মোষোকে জল ভরে। মোষ-কালো চামড়ার মোষোকটা

ঘাড় তুলে হাঁ করে জল খায়, যেন একটা জল-জন্তু; পেটটা তার ক্রমেই ফুলতে ফুলতে চকচক করতে থাকে। মোষোকটা ফাটার উপক্রম হতেই ভিস্তি একটা সরু চামড়ার গলাট দিয়ে সেটাকে বেঁধে নিয়ে গায়ের জল মুছিয়ে যেন পোষা জানোয়ারের মতো পিঠে তুলে নিয়ে চলে যায়, খানিক দৌড়, খানিক আস্তে চলা মিলিয়ে একটা চমৎকার চালে মাটির দিকে বুক ঝুঁকিয়ে। বাঁধা কাজে বাঁধা ভিস্তি, তার চাল-চোল সমস্তই এমন বাঁধা ছিলো যে মনেই আসতো না সে মরতে পারে, বদলাতে পারে। ঘড়ির মতো দস্তুরমাফিক বাঁধা নিয়মে কাজ বাজিয়ে চলতো; দাঁড়াতো যেখানকার সেখানে, জল ভরতো যেখানকার সেখানে, চলে যেতোও যেখানকার সেখানে দিনের পর দিন। তার চেহারা দেখিনি; শুধু তার চলার ভঙ্গী, কাপড়ের রঙ—এই বিশেষত্ব দিয়েই তাকে আমি দেখতে পাই—সেকাল একাল সব কালেই সে একই ভিস্তি। কাকগুলো যেভাবে কালের পরিবর্তন ছাড়িয়েছে, ভিস্তিগুলোও সেই ভাবে তখনও যে, এখনও সে রয়েছে ভিস্তিই। কৃষ্ণনগরের ভিস্তি পুতুল, যাত্রার সাজা ভিস্তি, বহুরূপীর ভিস্তি, আরব্য উপন্যাসের ভিস্তি—সবগুলোর সঙ্গে মিলে আছে সেই পঞ্চাশ বছর আগেকার ভিস্তি একজন, যে ঘড়ি ধরে জল ভরতো মোষোকে। সেই সেকালের ভিস্তির বেশে বা চেহারায় যদি একটু বিশেষত্ব থাকতো তবে একালের ভিস্তির সঙ্গে অভিন্ন হতে পারতোই না সে—সে যেন একটা সনাতন চিরন্তন জীবের মতো তখনো ছিলো এখনো আছে।

ভিস্তি চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই মাথায় ফেটি বেঁধে দু'হাতে দুই ঝাঁটা নিয়ে দেখা দিতো একটা মানুষ। জাতে সে ডোম, তার নাম ছিলো শ্রীরাম, কিন্তু ডাকতো সবাই ছীরে বলে। সে দুই হাত খেলিয়ে চট্‌পট দুটো কলমের মতো করে কাটা ঝাঁটা বুলিয়ে যায়। নিমেষে সব রাস্তাই ঢেউ খেলানো দুই প্রস্থ রেখায় অতি আশ্চর্য অতিপরিষ্কার ভাবে নক্সা টানা হয়ে যায়। চমৎকার চুনোট-করা গেরুয়া কাপড়ে সমস্ত সদর রাস্তাটা যেন মোড়া হয়ে থাকে খানিকক্ষণ ধরে। রাস্তার আর্টিষ্ট, ধুলোর আর্টিষ্ট, ডবল ঝাঁটার আর্টিষ্ট—তার কাজ দেখে চোখ ভুলে থাকতো কতোক্ষণ। আমরা যেমন ছবির নানা কাজে নানা রকম সরু মোটা ভোঁতা চেটালো তুলি রাখি, আমাদের ছীরে মেথরও কাছে রাখতো রকম-বেরকম ঝাঁটা। রাস্তার ঝাঁটা ছিলো তার কলমের মতো ডগার একধারে ছোলা; জলের নর্দমা পরিষ্কার করবার জন্যে রাখতো সে দাড়ি কামানো বুরুশের মতো ছোটো এবং মুড়ো ঝাঁটা; বাগানের পাতা-লতা। কুটো-কাটা ঝাঁটানোর জন্যে ছিলো চোঁচের মতো খোঁচা দু'ফাঁক ঝাঁটা যাতে সামান্য কুটোটিও ঝুড়িতে তুলে নেওয়া চলে অনায়াসে; উঠোন, দালান, বারান্দা ঝাঁটানোর ঝাঁটা ছিলো চামরের মতো হালকা ফুরফুরে, বাতাসের মতো হালকা পরশ বুলিয়ে চলতো মেঝের উপরে। এই নানারকম ঝাঁটার খেলা খেলিয়ে চলে যেতো সে রোজই। আঙ্গিনা, রাস্তা, অলি-গলি, বারান্দা ঝেঁটিয়ে যেতো ছীরু যখন তকতকে পরিষ্কার করে, তখন তারই উপরে চলতো যাত্রা অভিনয় আবার।

এবারে কেবল চলন্ত ছবি! একটা ছোট্ট টাট্টু ঘোড়া, তার চেয়ে ছোট্ট একটা পাল্‌কি-গাড়ি টানতে টানতে পুরনো বাড়ির ফটকে এসে দাঁড়াতেই বাক্সর মতো ছোট্ট গাড়ি থেকে মোটা-সোটা গম্ভীর এক বাবু নেমে পড়েন, মাথার চুল তাঁর কদম ফুলের মতো ছাঁটা। সোয়ারি নামতে না নামতে বোঁ করে গাড়িটা গোল চক্করের পশ্চিম দিকের অশ্বত্থ তলায় গিয়ে দাঁড়িয়ে ঘোড়াটাকে ছেড়ে দেয়। ছোট্ট ঘোড়া অমনি ছোট্ট ফটক ঠেলে কচি ঘাস চোর কাঁটা ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেতে লাগে, আর গাড়িখানা কুমির পোকার শুঁড়ের মতো বোম জোড়া আকাশে উঁচিয়ে নৈঋত কোণের দিকে চেয়ে তার বাবুর জন্যে অপেক্ষা করে থাকে।

একটা ছাতি আস্তে আস্তে ফটকের দিকে এগিয়ে চলে, অথচ মানুষ দেখিনে তার নিচে। হঠাৎ দেউড়ির কাছে এসে ছাতিটা বন্ধ হয়ে তলাকার ছোট্ট মানুষটিকে প্রকাশ করে দেয়—মাথায় চকচকে টাক, ছোট্ট যেন একটি মাটির পুতুলের মতো বেঁটেখাটো মানুষটি। ঘণ্টা বাজে এবার সাতবার, তারপর খানিক ঢং ঢং ঢং টান দিয়ে সাড়ে সাত বুঝিয়ে থামে। রোদ এসে পড়ে লাল রাস্তার উপরে একফালি সোনার কাগজের মতো।

চীনেদের থিয়েটার দেখা যেমন খাওয়া-দাওয়া গল্প-গুজবের সঙ্গে চলে, আমাদের যাত্রা দেখা যেমন—খানিক দেখে উঠে গিয়ে তামাক খেয়ে নিয়ে, কিংবা হয়তো ঘরে গিয়ে এক ঘুম ঘুমিয়ে এসেও দেখা চলে, তেমনি ভাবের দেখাশোনা চলতো এই উত্তর দিকের জানলায় বসে।

হয়তো ঘরের ওধারে একটা কৌচের তলায় ঢুকে রবারের গোলাটা পালায় কোথায় এই সমস্যার মীমাংসা করতে কৌচের তলায় নিজেই একবার ঢুকে পড়তে চলেছি, পা দুটো আমার হারু সহরের দরজায় গিয়ে ঠেকে ঠেকে, ঠিক সেই সময় খড়খড়ির আসরের দিক থেকে ঘোড়দৌড়ের শব্দ আর সহিসদের হৈ-হৈ রব উঠলো। অমনি নিজের রিজার্ভ বক্সে হাজির। দেখি গোল চক্কর ঘিরে ঘোড়দৌড় বেধে গেছে! সহিস, কোচম্যান, দরোয়ান যে যেখানে ছিলো সবাই মিলে ঘোড়া পালানোর আর ঘোড়া ধরার অভিনয় করতে লেগে গেছে। এই অশ্বমেধের ঘোড়া ধরা দিয়ে সকালের উত্তর-কাণ্ডের পালা প্রায়ই বেলা দশটাতে কিছুক্ষণের জন্যে বন্ধ হতো। স্নান আহারের জন্যে একটা মস্তো ইন্টারভাল্। যাত্রা নিশ্চয়ই চলতো তখনো—কেন না এই উত্তর আঙ্গিনাটা ছিলো সাধারণ দিক; বাড়ির কাজকর্মে লোকের যাতায়াতের অন্ত ছিলো না, কামাই ছিলো না সেখানে। প্রবেশ আর প্রস্থান—এই ছিলো ওদিকের নিত্যকার ঘটনা।

দুপুরবেলা নিঝুমের পালা চলেছে এখানটায় দেখি। উত্তরের আঙ্গিনার পশ্চিম কোণে আধখানা তেঁতুল আর আধখানা বাদাম গাছের ছাওয়াতে খোলার ঘরটা—ঘরের চাল ধনুকের মতো বেঁকে প্রায় মাটি ছুঁয়েছে। ঘরের সামনে আধখানা মাটিতে পোঁতা একটা মেটে জালা, তাই থেকে ছীরে মেথর জল তুলে তুলে গা ধুচ্ছে আর ক্রমান্বয়ে ইংরিজিতে নিজের বৌকে গাল পাড়ছে, আর বৌটা বাংলাতে বকে চলেছে তার সঙ্গে।

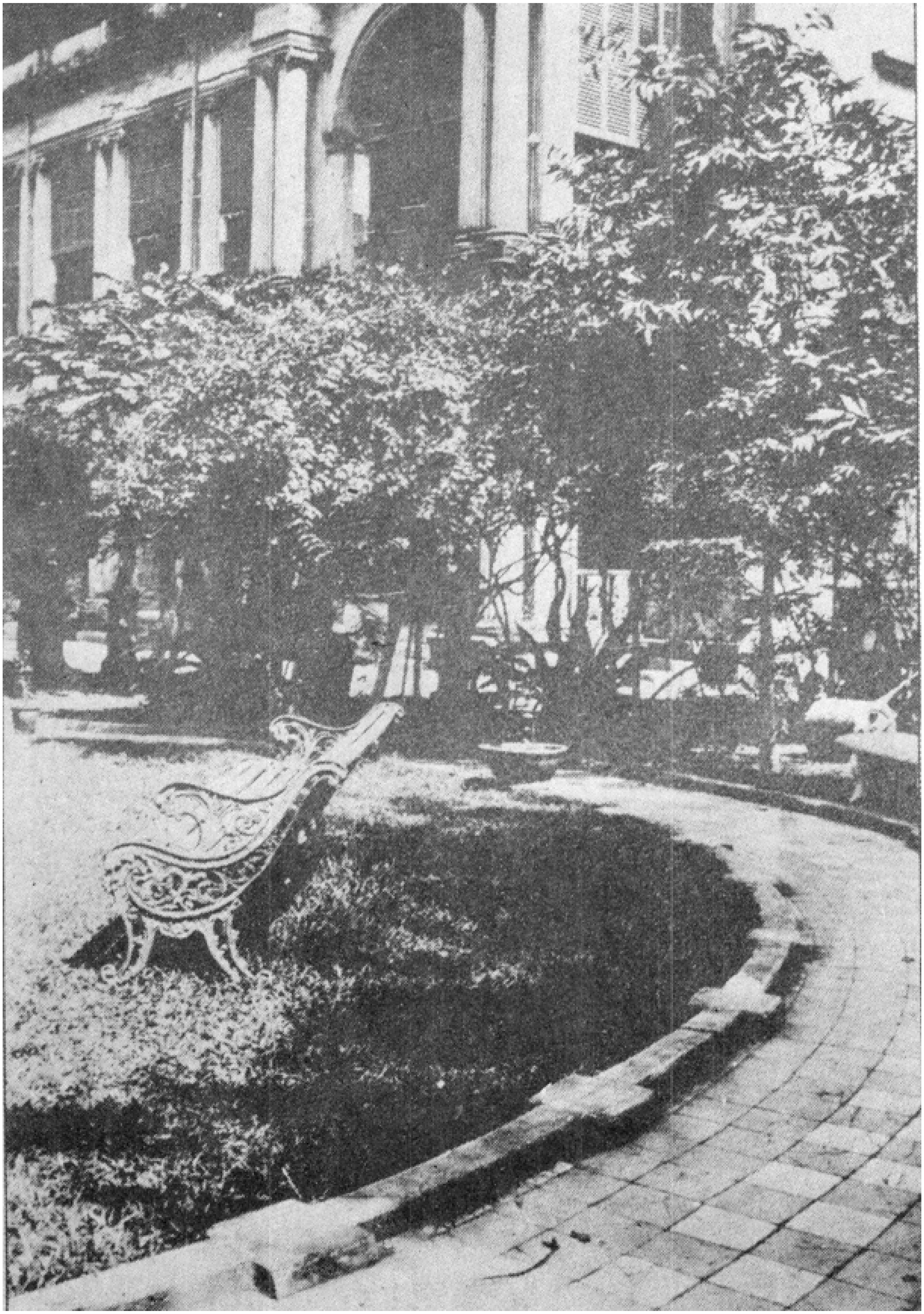
আস্তাবলের সামনে খাটিয়া, তার উপরে পাতা কালো কম্বল, তাতেই শুয়ে ঝকঝকে ঘোড়ার সাজ আর শিকলি। ঘরের মধ্যে ছোট্ট একটা টাটু ঘোড়ার শেষের পা দুটো আর চামরের মতো ল্যাজটা দেখা যায়।

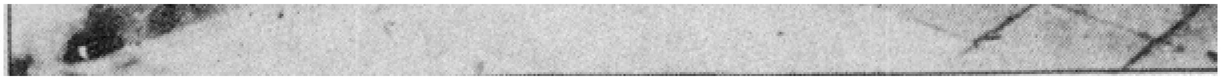
ল্যাজটা ছপ্ ছপ্ করে মশা তাড়ায়, আর পা-দুটো তালে তালে ওঠে পড়ে, কাঠের মেঝেতে খটাস্ খট্ শব্দ করে। গোল চক্করের পশ্চিমে আর একটা পাঁচিল-ঘেরা চৌকোনা জায়গা কখনো কপি কখনো বেগুন এই দুই রঙের পাতায় ভরাই থাকতো সেটা। চক্করের পুবধারে আর একটা ঘেরা জমি, সেটার ফটকের দুই ধারের দেওয়ালে চুন-বালিতে পরিষ্কার করে তোলা দুটো হাতি নিশেন পিঠে পাহারা দিচ্ছে। টিনের একটা খালি ক্যানেস্তারা কাদায় উল্‌টে পড়ে আছে; সেইখানটায় হিজিবিজি চাকার দাগ রাস্তায় পড়েছে, তাতে একটু জল বেধে আছে; পাতিহাঁস ক'টা হেলতে দুলতে এসে সেই কাদাজলে নাইতে লেগে যায়। থেকে থেকে মাথা ডোবায় জলে আর তোলে, ল্যাজের পালক কাঁপায়, শেষে এক-পায়ে দাঁড়িয়ে ভিজে মাথা, নিজের পিঠে ঘষে আর ঠোঁট দিয়ে গা চুলকে চলে। একটা বুড়ো রামছাগল ফস্ করে রাস্তা থেকে একটা লেখা কাগজ গিলে ফেলে চট্‌পট্, তারপর গম্ভীর ভাবে এদিক ওদিক চেয়ে চলে যায় সোজা ফটক পেরিয়ে রাস্তা বেড়াতে দুপুরবেলা। গোল চক্করের পুব গায়ে একটা আধ-গোল আধ-চৌকো চক্কর—মরচে ধরা ফুটো ক্যানেস্তারা, খড়কুটো, ভাঙা গামলা, পুরনো তক্তপোশের উই-খাওয়া ফর্মা আর একরাশ ছেঁড়া খাতায় ভরতি। সেখানে

গোটা কয়েক মুরগি চরে—ছাই রঙ, পাটকেল রঙ। শাদা একটা মস্ত মোরোগ তার লাল টুপি মাথায়, পায়ে হলদে মোজা, গায়ের পালক যেন হাতির দাঁতকে ছুলে কেউ বসিয়েছে একটির পাশে আর একটি। মোরোগটা গোল চক্করের ফটকের একটা পিলপে দখল করে বসে থাকে, নড়ে না চড়ে না।

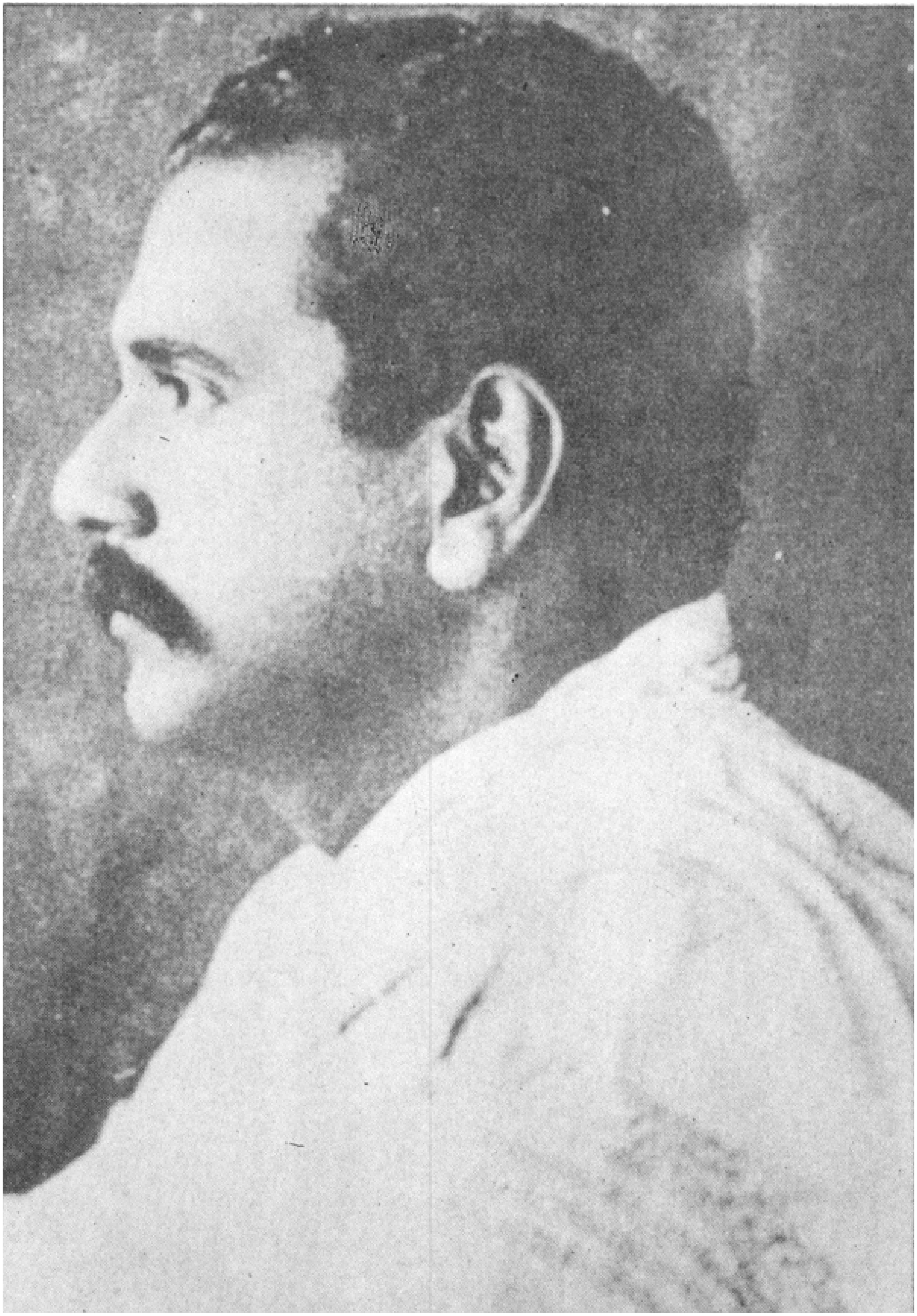


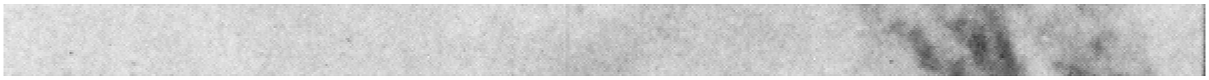
জোড়াসাঁকো ঠাকুবাড়ি



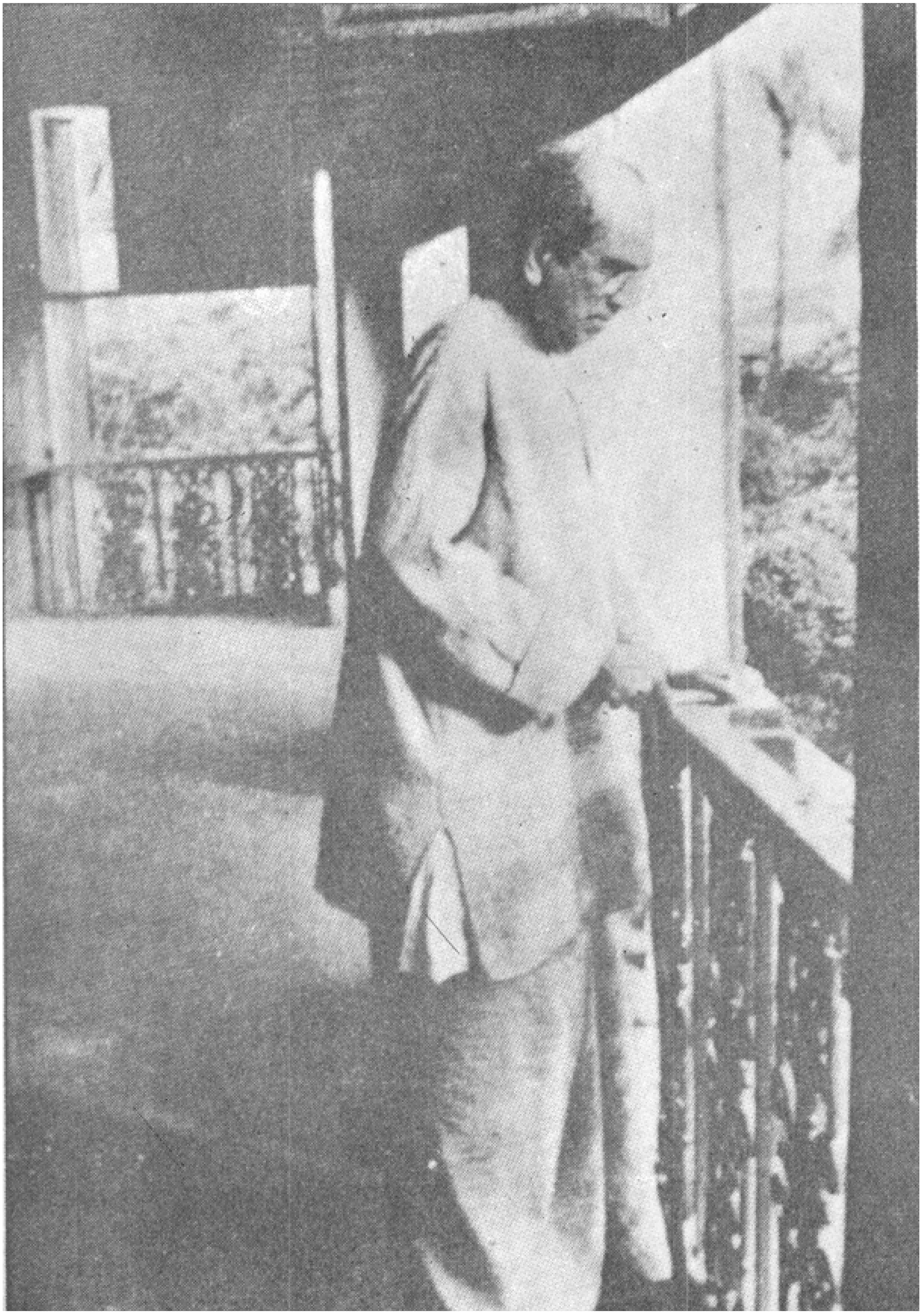


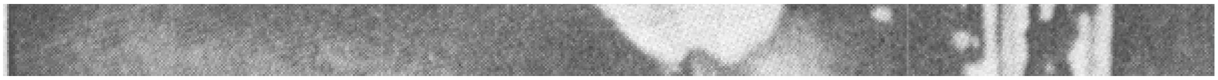
সাজানো বাগান



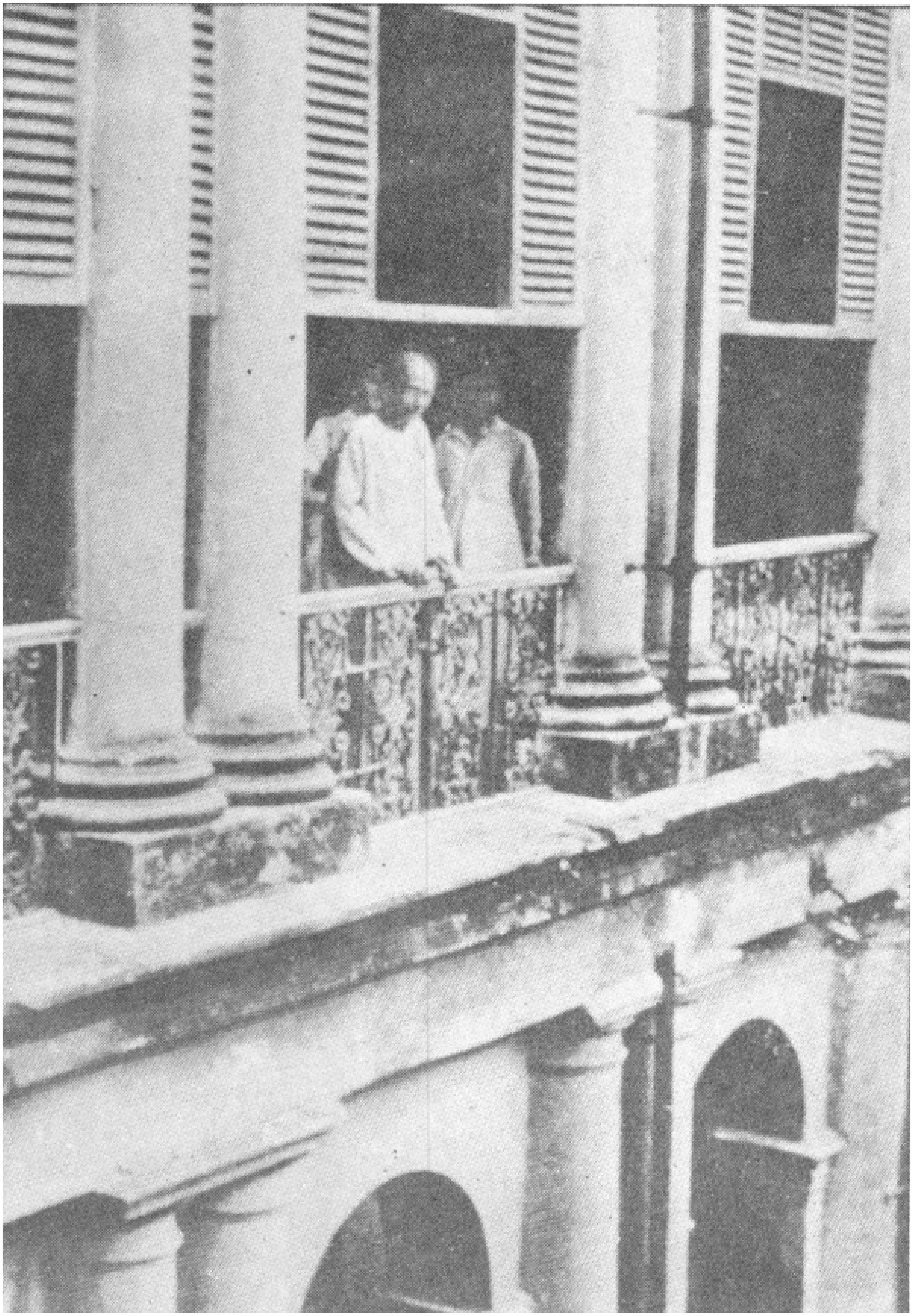


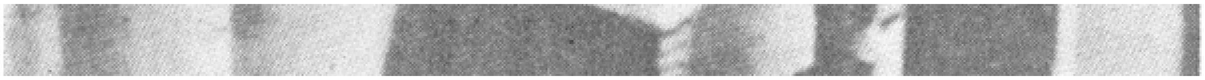
অবনীন্দ্রনাথ



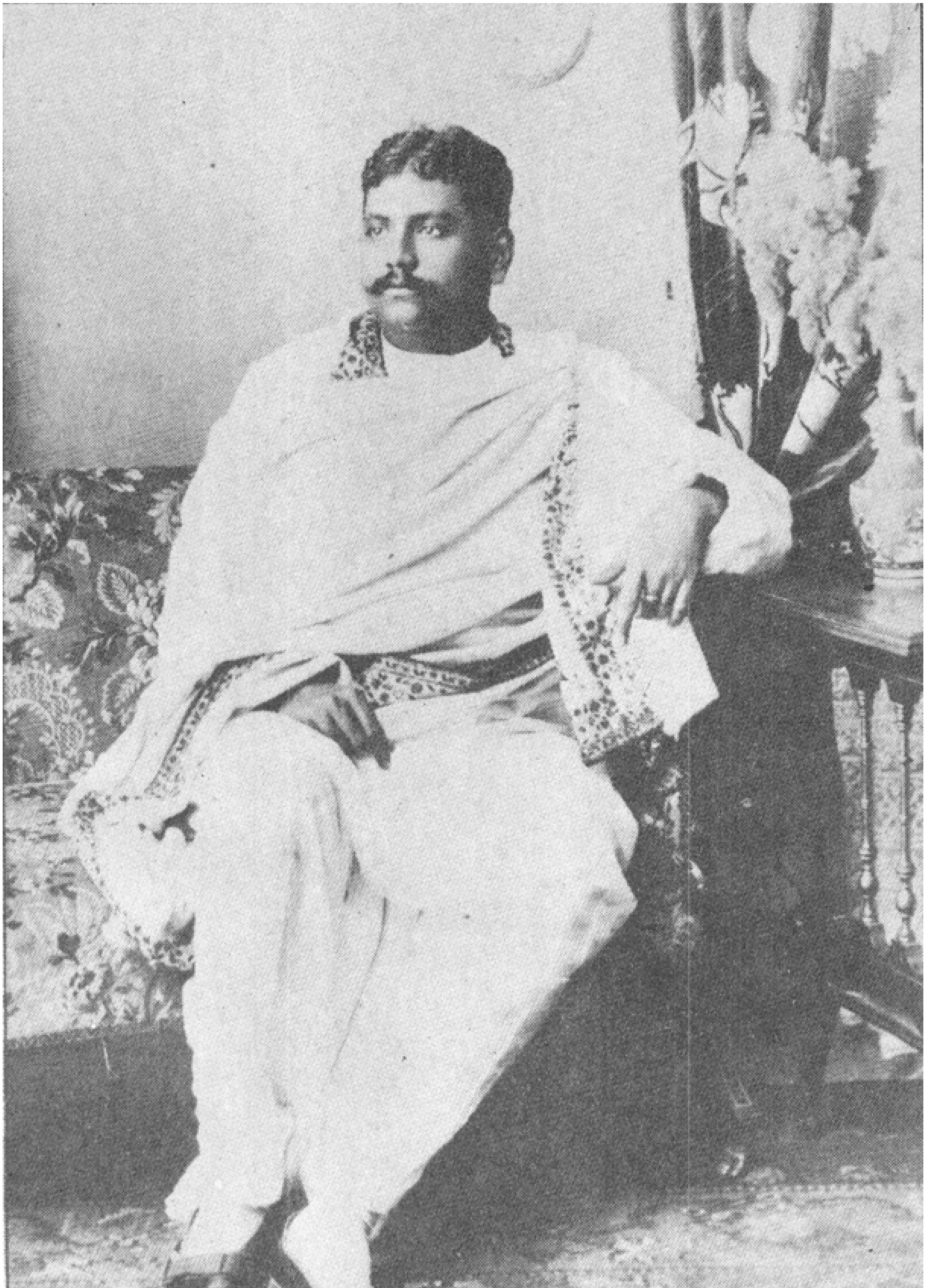


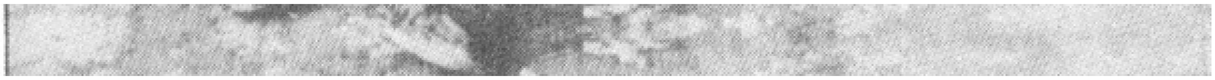
দক্ষিণের বারান্দায়





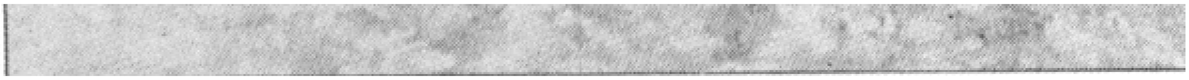
দক্ষিণের বারান্দায়



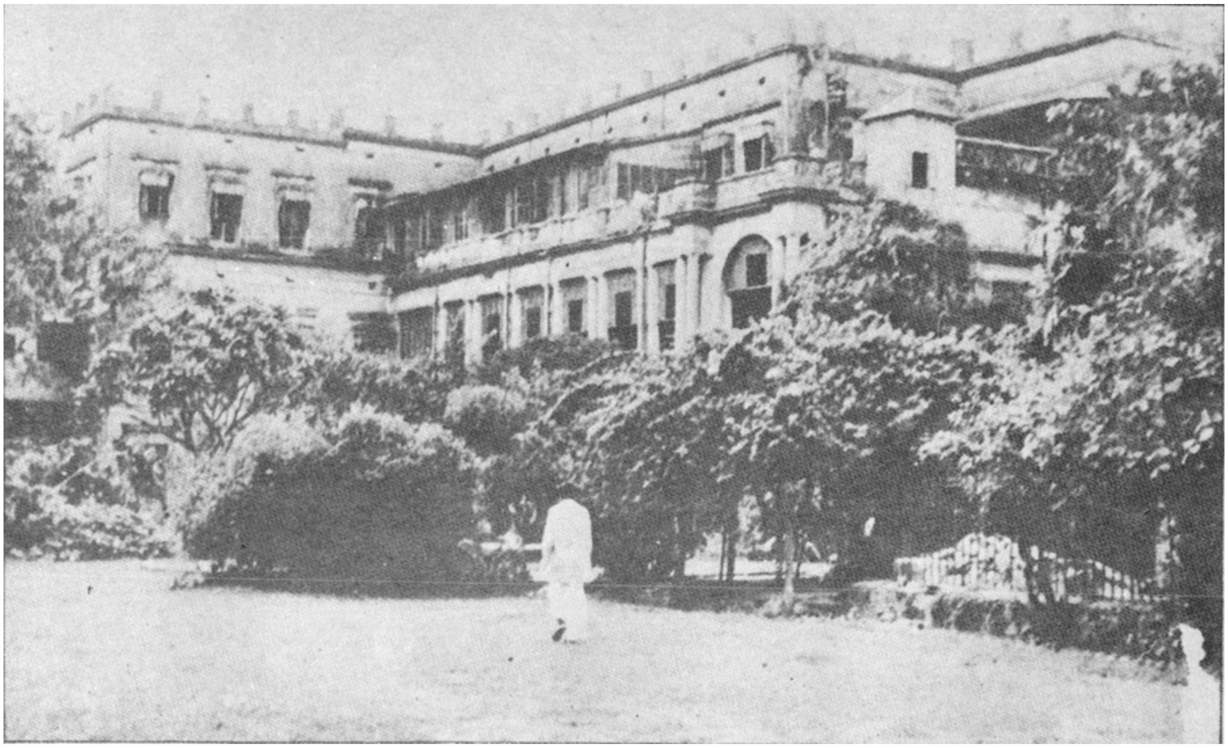


অবনীন্দ্রনাথ





যৌবনে তিন ভাই-সমরেন্দ্র-অবনীন্দ্র-গগনেন্দ্র



দক্ষিণের বাগানসহ জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ি

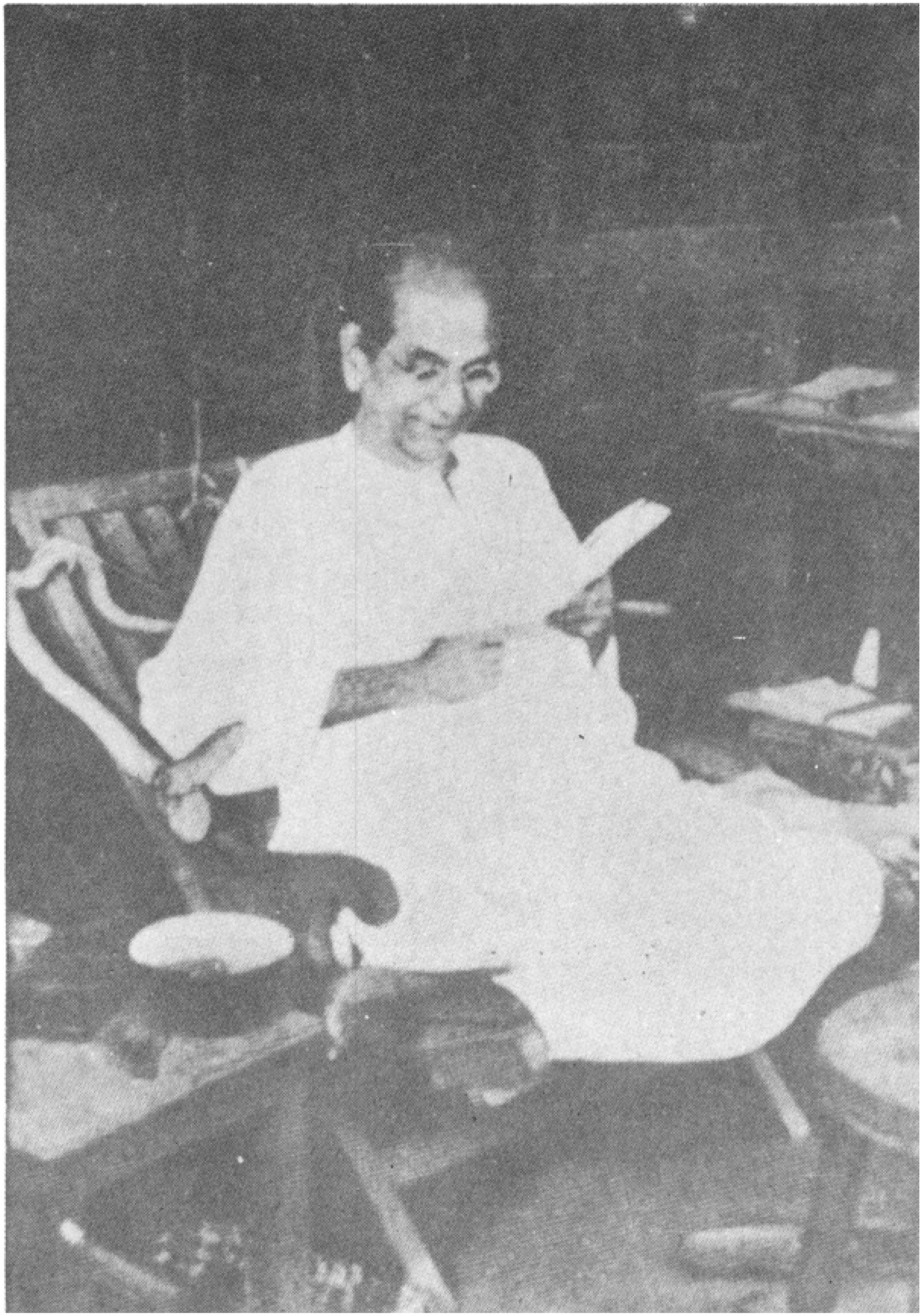
পৌত্র মোহনলাল, শোভনলাল ও অমিতেন্দ্রনাথ সহ

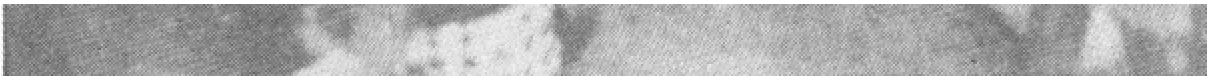


পৌত্র মোহনলাল, শোভনলাল ও অমিতেন্দ্রনাথ সহ

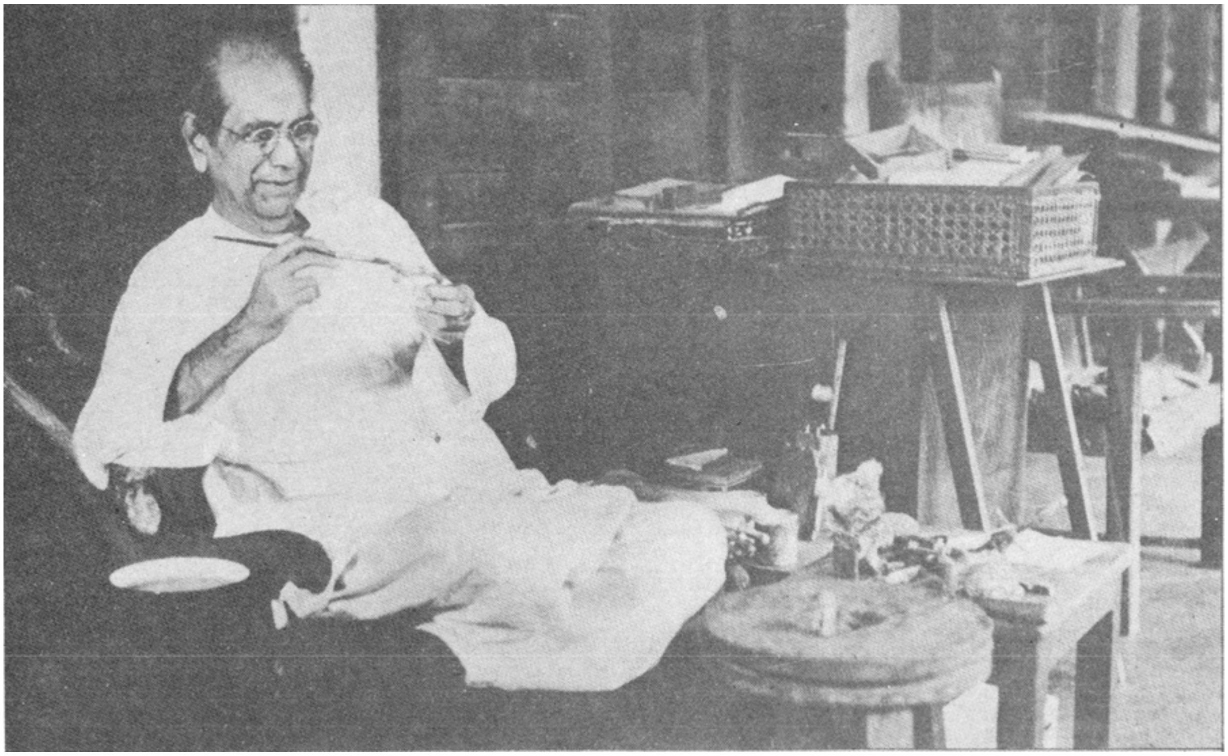


১৩৪৮ সালে





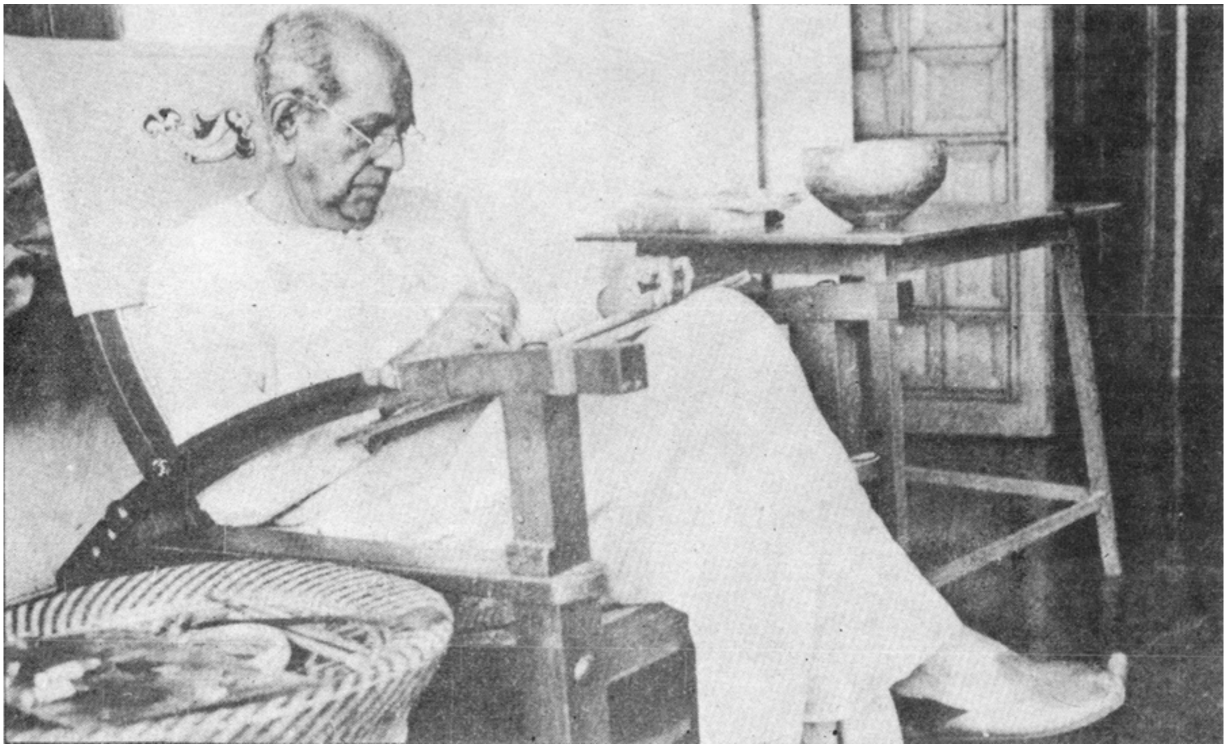
‘ঘরোয়া’ পড়ছেন



পুতুল তৈরি করছেন

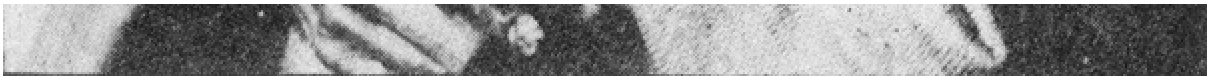


সুরসাধনায় অবনীন্দ্রনাথ



শান্তিনিকেতনে (অঙ্কনরত)

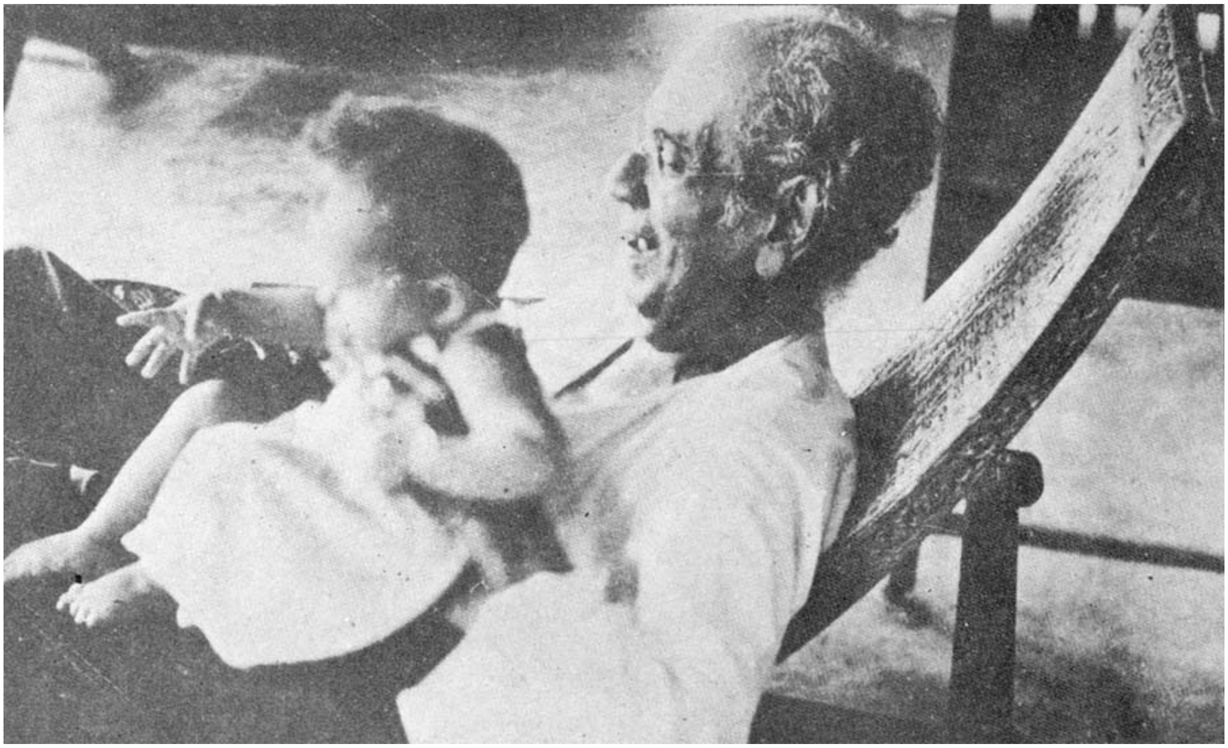




১৩৫০ সালে



‘গুপ্তনিবাস’-এর জীর্ণ দেওয়ালে অঙ্কিত ফ্রেসকো

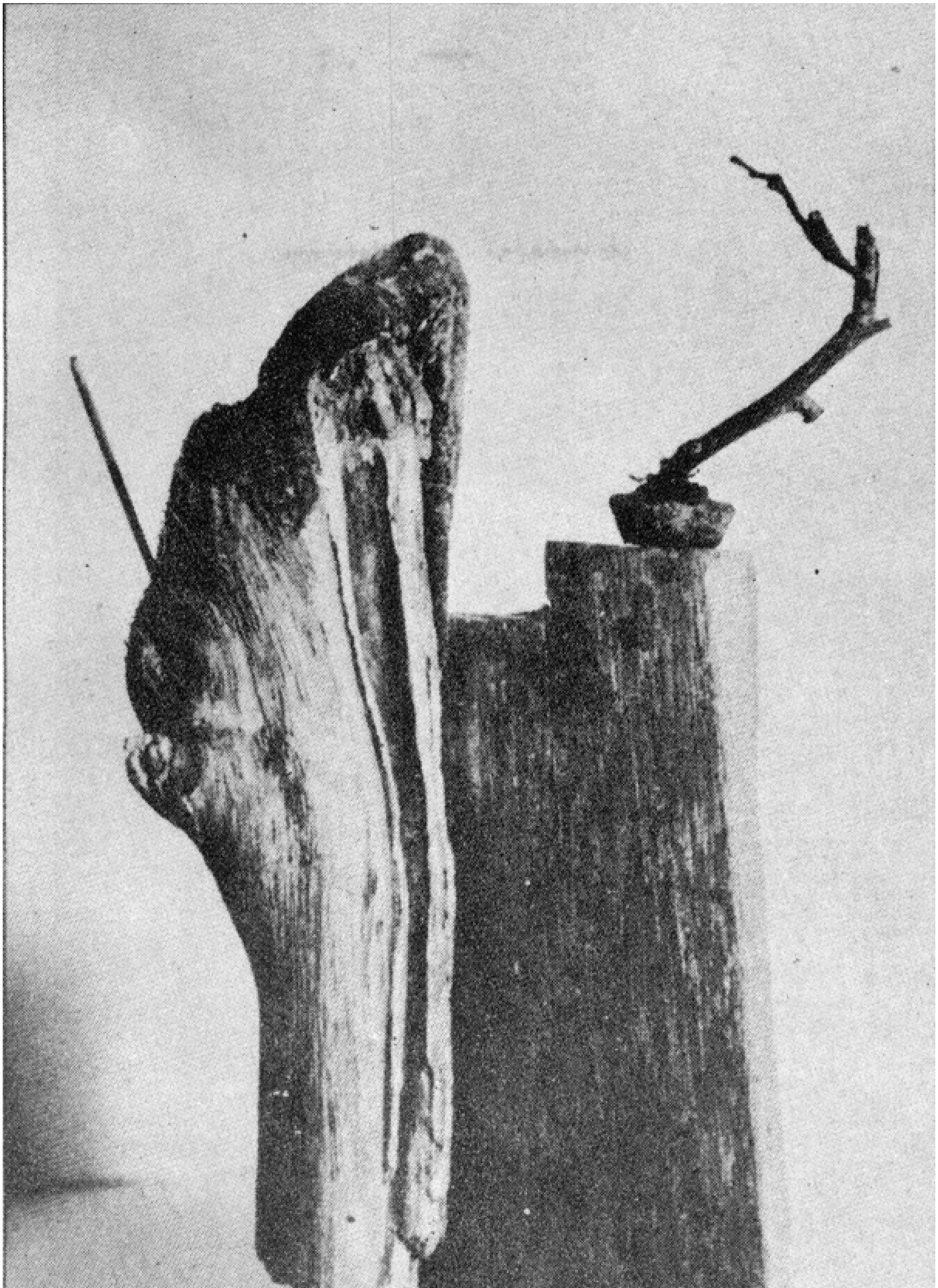


মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের কন্যা ঊর্মিলা সহ

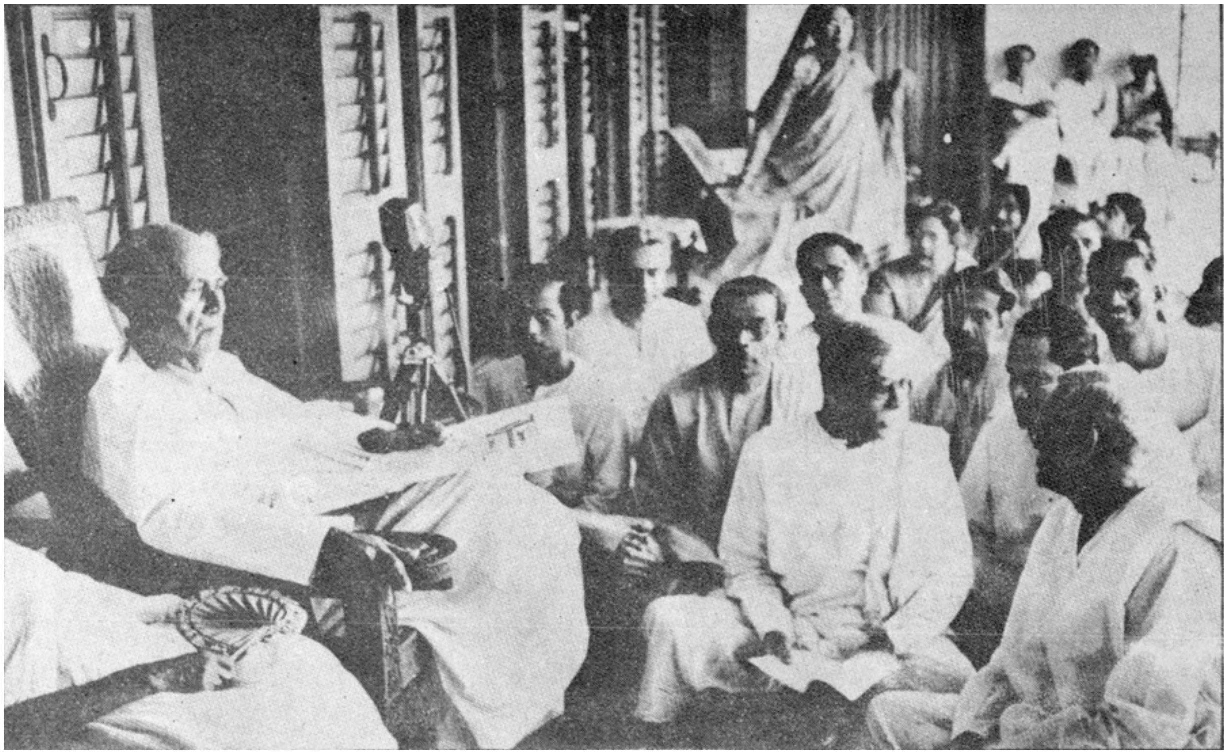




কাটুম-কুটুম (শিল্পকর্ম)



অবনীন্দ্রনাথের তৈরি রবীন্দ্রনাথের দারুমূর্তি



সপ্ততিতম জন্মদিনে অনুরাগী শিল্পী ও লেখকগণ পরিবৃত

বেলা চারটে পর্যন্ত এই ভাবে নিঝুমের পালা চলে। ঢং ঢং করে আবার ঘড়ি পড়ে। একটার পর একটা ইস্কুল গাড়ি, পাল্‌কি এসে দলে দলে সোয়ারি নামিয়ে চলে। গোবিন্দ খোঁড়া রাজেন্দ্র মল্লিকের ওখানে রোজই ভাত খায় আর আমাদের গোল চক্করটাতে হাওয়া খেতে আসে। কতকালের পুরনো আঁকাবাঁকা গাছের ডালের মতো শক্ত তার চেহারা, ঠিক যেন বাইবেল কি আরব্য উপন্যাসের একটা ছবির থেকে নেমে এসেছে। গোল বাগানের ফটকের একটা পিলপে ছিলো তার পিঠের ঠেস। বৈকালে সেখানটাতে কারো বসবার যো ছিলো না। বাদশার মতো গোবিন্দ খোঁড়া তার সিংহাসনে খোঁড়া পা ছড়িয়ে বসে যেতো! পাহারাওয়ালা, কাবুলিওয়ালা, জমাদার, সরকার, চাকর, দাসী—সবার সঙ্গেই আলাপ চলে, খাতিরও সকলের কাছে যথেষ্ট তার। শহর-ঘোরা সে যেন একটা চলতি খবরের কাগজ কিংবা কলকাতা গেজেট! পাঁচিলের উপর বসে সে খবর বিলোতো। শুনেছি প্রথমবার প্রিন্স আসবার সময় পুলিশ থেকে তেল বিলিয়ে গরিবদের ঘরেও দেওয়ালী দেবার ব্যবস্থা করা হয়েছিলো। গোবিন্দর ঘর-দুয়োর কিছুই নেই—সে ভোজনং যত্র তত্র, শয়নং হট্টমন্দিরে গোছের মানুষ, এটা পাহারাওয়ালারা সবাই জানতো। তারা গোবিন্দকে ধরে বসলো পিদুম জ্বালাতেই হবে—ঘর না থাকে ঘর ভাড়া করেও পিদুম জ্বালানো চাই। গোবিন্দ তখন আমাদের গোল চক্করে দরবারে বসেছে;

পুলিশের রহস্যটা বুঝেও যেন সে বোঝেনি এইভাবে পাহারাওলাকে শুধুলে, ‘সরকার থেকে কতোটা তেল গরিবদের দেওয়ানোর হুকুম হলো?’ এক-পলা করে তেল বিনামূল্যে দেওয়ানোর কথা যেমন পুলিশম্যান গোবিন্দকে বলা, অমনি জবাব সঙ্গে সঙ্গে—‘যাঃ, যাঃ, তোর বড়সায়েবকে বলিস, গোবিন্দ এক সের তেল নিজে থেকে খরচ করচে।’ ভিক্টোর হিউগোর গল্পের একটা ভিখারীর সর্দারের মতো এই গোবিন্দ খোঁড়ার প্রতাপ আর প্রতিষ্ঠা ছিলো তখনকার দিনে। এখন হলে পুলিশের সঙ্গে তকরার, সিডিশান, রাজদ্রোহ, এমনি কিছুতে ধরা পড়ে যেতো নিশ্চয় গোবিন্দ।

এদিকে গোবিন্দ খোঁড়ার দরবার গোল চক্করের পাঁচিলে, ওদিকে নহবতখানার ছাতে বসেছে তখন আমাদের সমশের কোচম্যানের মজলিশ দড়ির খাটিয়া পেতে। সে যেন দ্বিতীয় টিপু সুলতান বসে গেছে ফরসি হাতে। হাবসির মতো কালো রঙ, মাথার চুল বাবরিকাটা, পরনে শাদা লুঙ্গি, হাতকাটা মেরজাই, চোখে সুর্মা, মেদিতে লাল মোচড়ানো গোঁফ, সিঁথেকাটা দাড়ি। বাবামশায় হাওয়া খেতে যাবার পূর্বে ঠিক সময়ে সে সেজেগুজে বার হতো। চুড়িদার পাজামা, রূপোলি বকলস দেওয়া বার্নিশ জুতো, আঙুলে রূপো বাঁধা ফিরোজার আংটি, গায়ে জরিপাড়ের লাল বনাতের বুক কাটা কাবা তকমা আঁটা, কাঁধে ফুল-কাটা রুমাল, মাথায় থালার মতো মস্ত একটা শামলা, কোমরে দুই সহিসে মিলে জড়িয়ে দিয়েছে লম্বা সাপের মতো জরির কোমর-বন্ধ। ফিটফাট হয়ে সমশের লাল চক্করের পাঁচিলের চাবুক হাতে দাঁড়াতো আর সহিস শাদা জুড়ির ঘোড়া দুটোকে চক্করের মধ্যে ছেড়ে দিয়ে বাইরে থেকে ফটক বন্ধ করে দিতো। তখন শাদা ঘোড়া দুটোকে প্রায় দশ মিনিট সার্কাসের ঘোড়ার মতো চক্কর দিইয়ে তবে গাড়িতে জোতার নিয়ম ছিলো। পাছে রাস্তায় ঘোড়া বজ্জাতি করে সেই জন্যে তাদের আগে থাকতে টিট করাই উদ্দেশ্য। এই দুর্দান্ত কোচম্যান, ঘোড়াও তার তেমনি, গাড়ি-খানা থেকে ঝড়ের মতো বেরিয়ে পড়তো। কোচবাক্সের উপরে দেখতেম খাড়া দাঁড়িয়ে সমশের হাঁকড়াচ্ছে চাবুক! ফেটিং-গাড়ি ছিলো খুব উঁচু। গাড়িবারান্দার খিলেনের কাছটাতে এসেই ঝপ করে সমশের নিজের আসনে বসে পড়তো গম্ভীর হয়ে! তারপরে এক সময়ে ঘোড়া, গাড়ি, কোচম্যান, সাজগোজ, সব নিয়ে একটা জমজমাট শোভাযাত্রার দৃশ্য রাস্তার উপর খানিক ঝলক টেনে বেরিয়ে যেতো গড়ের মাঠে—আতর গোলাপের খোশবুতে যেন উত্তর দিকটা মাত করে দিয়ে!

এরই একটু পরেই নন্দ ফরাস দু'হাতে আঙুলের ফাঁকে বড়ো বড়ো তেলবাতির সেজ দুটো অদ্ভুত কায়দাতে হাতের তেলোয় অটল ভাবে বসিয়ে উঠে চলতো ফরাশখানা থেকে বৈঠকখানায়। তারপর ড্রপ পড়তো রঙ্গমঞ্চে, এবং নোটো খোঁড়া, নন্দ ফরাশ দুয়ে মিলে বেহালা বাদন দিয়ে সেদিনের মতো পালা সাঙ্গ হতো সন্ধ্যেবেলায়। তখন পিদুমের ধারে বসে রূপকথা শোনা, ইকড়ি মিকড়ি, ঘুঁটি-খেলার সময় আসতো। সেই ঘরের এককোণে বসে রূপকথা বলে একটা দাসী—দাসীটার চেয়ে তার রূপকথাটাকে বেশি মনে পড়ে। এই দাসীটা ছিলো আমার ছোটো বোনের। সে বলে তার দাসীর নাম ছিলো মঞ্জরী। আর দোয়ারি চাকর এই কবিত্বপূর্ণ মঞ্জরী নামটির নাকের ডগাটা বঁটির ঘায়ে উড়িয়ে দিয়েছিলো তাও বলে সে; কিন্তু আমি দেখি মঞ্জরীকে শুধু একটা গড়া-পরা নাক ভাঙা নাম, বসে আছে একটা লাল চামড়ার তোরঙ্গ ঠেস দিয়ে দুই পা ছড়িয়ে। তোরঙ্গটার সকল গায়ে পিতলের পেরেক মালার মতো করে আঁটা। মঞ্জরী ঝিমোচ্ছে আর কথা বলছে: ‘এক ছিলো টুনটুনি—সে নিমগাছে বাসা না বেঁধে রাজবাড়ির ছাতের আল্‌সেতে থাকে, আর রাজপুত্তুরের তোশক থেকে তুলো চুরি করে করে ছোট্ট একটি বাসা বাঁধে।’

ছাতে ওঠবার সিঁড়ি বলে একটা কিছু নেই তখনো আমার কাছে, অথচ টুনটুনির বাসার কাছটায়—একেবারে নীল আকাশের গায়ে, ছাতের কার্নিসে উঠে গিয়ে বসি পা ঝুলিয়ে। এমনি দিনের বেলায় রূপকথার সিঁড়ি ধরে পাখির সঙ্গে পেতেম ছাতের উপরের দিকটা। আবার রোজই নিশুতি রাতে মাথার উপরে পেতেম শুনতে হুটোপুটি করছে ছাতটা—ভাটা গড়গড় গড়াচ্ছে, দুমদুম লাফাচ্ছে! ছাতটা তখন ঠেকতো ঠিক একটা অন্ধকার মহারণ্য বলে—যেখানে সন্ধ্যেবেলা গাছে গাছে ভোঁদড় করে লাফালাফি, আর আকাশ থেকে জুঁই ফুল টিকিতে বেঁধে ব্রহ্মদৈত্য থাকে এ-ছাত ও-ছাত পা মেলে দাঁড়িয়ে। এমনি করে গল্প-কথার মধ্যে দিয়ে কতো কি দেখেছি। তখন! যখন চোখও চলে না বেশিদূর, পা-ও হাঁটে না। অনেকখানি, তখন কান ছিলো সহায়। সে এনে পৌঁছে দিতো কাছে ছাত, হাতে এনে দিতো কমলাফুলির টিয়েপাখি, চড়িয়ে দিতো আগডুম-বাগডুম ঘোড়ায়, লাটসাহেবের পাল্‌কিতে এবং নিয়ে যেতো মাসিপিসির বনের ধারের ঘরটাতে আর মামার বাড়ির দুয়োরেও! মায়ের অনেকগুলি দাসী ছিলো—সৌরভী, মঞ্জরী, কামিনী কতো কি তাদের নাম। অনেকদিন অন্তর দেশে যেতো এরা সব গাঁয়ের মেয়ে—অনেকদিন পরে ফিরতো আবার। কখনো বা এরা দলবেঁধে যেতো গঙ্গা নাইতে পার্বণে, আর নিয়ে আসতো দু'চারটে করে খেলনা, পীরের ঘোড়া, সবজে টিয়ে, কাঠের পাল্‌কি, মাটির জগন্নাথ, সোনার ময়ূর। আতা গাছে তোতা, ঢেঁকি, বঁটি। এমনি জানা রূপকথার দেশের, ছড়ার দেশের পশু, পক্ষী, ফুল, ফল, তৈজসপত্র সবাইকে পেতেম চোখের কাছেই কিন্তু মাসিপিসির ঘর আর মামার বাড়ি দেখা দিয়েও দিতো না—বাড়িও ছাতের মতোই অজ্ঞাতবাসে ছিলো। মঞ্জরী দাসী একমাত্র ছিলো, খেয়ালমতো খোলা জানলার ধারে তুলে ধরতো আর বলতো—ঐ দ্যাখ্ মামার বাড়ি। বাড়ির সন্ধানে উত্তর আকাশ হাতড়াতো চোখ, দেখতো না একখানিও ইঁট, শুধু পড়তো চোখে তখন আমাদের বাড়ির উত্তর-পশ্চিম কোণে মস্ত তেঁতুল গাছটার শিয়রে মন্দিরের চুড়োর মতো শাদা শাদা মেঘ স্থির হয়ে আছে! ঐটুকু দেখিয়েই দাসী নামিয়ে দিতো কোল থেকে খড়খড়ির তলার মেঝেতে। তারপর সে দরজা-জানলা বন্ধ করে দিয়ে রান্নাবাড়িতে ভাত খেতে যেতো একটা বগি-থালা সিন্ধুকের পাশ থেকে তুলে নিয়ে।

প্রায় রাতেরই মতো চুপচাপ আর অন্ধকার হয়ে যেতো ঘরখানা দিনে দুপুরে। সবজে খড়খড়িগুলো সোনালি দাঁড়ি টানা একটা-একটা ডুরে-কাপড়ের পর্দার মতো ঝুলতে চৌকাঠ থেকে—কাঠের তৈরি বলে মনেই হতো না জানলাগুলো! সুতোর সঞ্চারে পৌঁছতো এসে আকাশের দিক থেকে চিলের ডাক। বাতাসেরও ডাক খুব মিহি সুর দিয়ে কানে আসতে—ঝড়ের একটা আবছায়া মনে পড়তো—একটা দুটো কোমল টান প্রথমে, তারপর খানিক চড়া সুর, তারপর বেশ একটা ফাঁক, তার ঠিক পরেই একটানা তীব্র সুর বাতাসের। এমনি গোটা দুই তিন আওয়াজ আর কিছু নেই যখন তিনতলায়, তখন সেই নিঃসাড়াতে চোখ দুটো দেখতে বার হতো—যেন রাতের শিকারী জন্তু খুঁজতো। এটা, ওটা, সেটা, এদিক, ওদিক, সেদিক, সন্ধানে চলতো সেদিনের আমিও তক্তার নিচে, সিঁড়ির কোণে, সার্সির ফাঁকে, আয়নার উল্‌টো পিঠে এবং চৌকি বেয়ে আলমারির চালে নানা জিনিস আবিষ্কার করার দিকে। ছাতের কথা ভুলেই যাই—তখন ঘর দেখতেই মসগুল থাকে মন! এক ছোটো ছেলেমেয়েদের ছাড়া এই সময়টাতে খানিকক্ষণের মতো কাউকে পেতো না তিনতলার ঘরগুলো। কাজেই এ-সময়ে আমাদের সঙ্গে যেন ছাড়া পেয়ে জিনিসগুলোও হঠাৎ বেঁচে উঠতো, এবং তারাও বেরিয়েছে দিন দুপুরের অন্ধকারে খেলার চেষ্টায়—এটা ভাবে জানাতো।

সারা তিনতলার দেওয়াল, ছবি, সিঁড়ি, তক্তা, আলমারি, ফুলদানি, মায় মেঝেতে পাতা মস্ত জাজিম এবং কড়িতে ঝোলানো পাখাগুলোর সঙ্গে এমনি করে দুপুরে ঘরে ঘরে ফিরে আর উঁকি দিয়ে, সারা তিনতলা কতোদিনে পেয়েছিলেম, পুরোপুরি ভাবে তা বলা যায় না। একটা দোলনা-খাট—ছোট্ট, সেটা খাট থাকতে থাকতে হঠাৎ কবে একদিন জাহাজ হয়ে উঠলো এবং দুলে দুলে আমাদের নিয়ে সমুদ্রে চলাচল শুরু করলে। মস্ত জাজিম বিছানা ক'জোড়া ছোটো হাতের তাড়ায় যেন ফুলে ফুলে উঠলো—যেন ক্ষীর সাগরে ঢেউ তুলে। তক্তার উপরটার চেয়ে তক্তার নিচেটা কবে যে আপনাকে ভারি নিরিবিলি আরামের জায়গা বলে জানিয়েছিলো কোন তারিখে, কোন বছরে, কতোকাল আগেই বা—তা কি মনে থাকে? জানিনে, ভুলে গেছি এই হলো উত্তর তারিখের বেলায়। কিন্তু জিনিসের বেলাতে একেবারে তা নয়—এখনো পঞ্চাশ বছর আগেকার ঘরে ঘরে কোথায় কি তা স্পষ্ট দেখছি আমি—জিনিসগুলোকে একটুও ভুলিনি। কিন্তু আশ্চর্য এই, মানুষদের মধ্যে অনেকের চেহারাই লোপ পেয়ে গেছে এই তিনতলার থেকে, যেটার কথা আজ বলছি। কাঠের বেড়া দেওয়া দোলনা-খাট জাহাজ-জাহাজ খেলে যে-কোণে বসে আমাদের সঙ্গে, সেখান থেকে দেখা যায় উত্তরে সরু একফালি দেওয়ালে বোলানো একটি ছোট্ট আলমারি—ওষুধ থাকে তার মধ্যে! এই আলমারির চালে বসানো রয়েছে দেখি হলদে মাটির নাড়ুগোপাল। সে হামাগুড়ি দিতে দিতে হঠাৎ থেমে গিয়ে ডান হাতের মস্ত নাড়ুটা এগিয়ে দিয়ে চেয়ে আছেই আমার দিকে। এই গোপাল ছেলেটির পাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে রোগাপানা সরু গলার একটা নীল কাচের বোতল—রাঙা, হলুদ, কালো, শাদা রঙের টিকিট আঁটা সেটার গায়ে। নাড়ু দিয়ে লোভ দেখাতো মাটির হলেও নাড়ুগোপালটি। আর বিস্বাদ তেলের দু'তিন চামচ নিয়ে বসে থাকতো নীল কাচের বোতলটা। রঙিন টিকিট দিয়ে ভোলাতে চাইতো, কিন্তু পারতো না! আর একটা জিনিসকে দেখতে পাই—আনারপুরের জালি-কাপড়ে মোড়া একটা মস্ত ঢাকনা। ছোটো বোন যখন ছোটো ছিলো সে এই ঢাকনে পাখির মতো ঘুমের সময় চাপা পড়তো। যখন তাকে দেখেছি তখন সেটার কাজ গেছে। খালি ঢাকনাটা তখনো কিন্তু ঘরের পশ্চিম ধারে মস্ত একটা আলমারির চালে চড়ায় বেধে-যাওয়া উল্‌টোনো নৌকোর ছইখানার মতো কাত হয়ে থাকে। ঘরের দক্ষিণ গায়ে দেখতে পাই তিনটে মোটা মোটা পল্‌তোলা থাম। অন্ধকারের পর্দার উপরে মাঝের থামটা থেকে একগাছা মশারির দড়ি ঝুলছে, তার গায়ে সারিসারি মাছি বসে গেছে—কালো কালো ফুলের কুঁড়ির মতো, নড়ে না চড়ে না!

আমাদের ঘরের পশ্চিম গায়ে আর একটা ক্যাম্বিসের বেড়াঘেরা ঘর, চমৎকার করে সাজানো। মায়ের বসবার ঘর সেটা। সেখানে প্রত্যেক জিনিসটা দেখতে পাচ্ছি স্পষ্ট স্পষ্ট—যেখানকার যা ধরা রয়েছে, সব ঠিক ঠিক! আজও মনের মধ্যে রয়েছে—এই ঘরটার পুবদিকের দরজার কাছে একেবারে কাচের মতো পিছল কালো বার্নিশ মাখানো বাদামী টেবিল একটা পায়ে দাঁড়িয়ে। টেবিলের কিনারায় সোনালি পাড়, ঠিক মাঝে একটা পাহাড় আর সরোবরের ছবি লেখা। এই টেবিলের নিচে একটা কেমনতরো কল ছিলো, সেটাকে জোরে টান দিলেই টেবিলের উপরটা কাত হয়ে ফেলে দেয় বই, কাগজ, সেলায়ের বাক্স, উলবোনার কাঠি ইত্যাদি টুকিটাকি! এই টেবিলটার সামনে থাকে হলদে কাঠের ছোট্ট একখানা চৌকি ফুলকাটা কার্পেটে মোড়া, ঠেলা দিলে সেটা ভাঁজ হয়ে হাত-পা গুটিয়ে হঠাৎ চ্যাপটা হয়ে পড়ে যায় মাটিতে। এই ঘরে থাকে কাঠির মতো সরু সরু পা একজোড়া ইটালিয়ান কুকুর—কাচের পুতুলের মতো ছোট্ট। কুকুর দুটো পাঁউরুটি, বিস্কুট, মুরগির ডিম খায়। আমার জন্যে পড়ে থাকে কৌচের নিচে খালি ডিমের খোলাটা। লুকিয়ে সেটা চিবিয়ে খেয়ে ধরা

পড়ে যাই। হঠাৎ পিঠে পড়ে বেত, নীলমাধব ডাক্তার এসে পরীক্ষা করেন আমার হাইড্রোফোবিয়া হয় কি না; মা, পিশি, দাসী, সবাই ছি ছি করতে থাকে; বাবামশায় হুকম দেন আমাকে মংলু মেথরের কাছে পাঠিয়ে দিতে। মেথরের সঙ্গে থাকতে হবে শুনে ভয়ে ঘৃণায় লজ্জায় কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি আমি। শেষে দেয়ালের দিকে একঘণ্টা মুখ ফিরিয়ে থাকার শাস্তিটা বাবামশায় দিয়ে চলে যান অন্য ঘরে।

তখন কুকুর দুটোকে একদিন কি করে মেরে ফেলা যায় তারই ফন্দি আঁটি মেঝেতে পাতা মস্ত গালচের দিকে চেয়ে। এই গালচেখানাকে মনে পড়ে—বড়ো বড়ো সবজে পাতা আর শাদা ধুতরো ফুল, কালো জমির উপরে বোনা। ক'টা কৌচ নীল আর শাদা ছিট মোড়া রয়েছে এখানে ওখানে, আঁকা বাঁকা করে সাজানো। দুটো কৌচ চন্দ্রপুলির গড়ন, আর একটি দেখতে যেন তিনটে ব্যাঙ একসঙ্গে পিঠে পিঠে জোড়া কিন্তু ঝগড়া করে তিনদিকে মুখ ফিরিয়ে বসে আছে। ডবল ব্র্যাকেটের মতো করে কাটা, গোলাপী রঙের ছোপ ধরানো মার্বেল পাথরের একটা টেবিল এক কোণে রয়েছে, তার উপরে পাথরে কাটা দুটি পায়রা ফল খেতে নেমেছে—সত্যিকার মতো পাখি ও আপেলের রঙ দেখে লোভ জাগে মনে। ঘরের পশ্চিম-দক্ষিণ কোণে বড়ো হল্‌টাতে উঠে যাবার পাঁচ ধাপ সিঁড়ি—তারই গায়ে অনেক উপরে একটা ব্র্যাকেটে তোলা আছে, চৌকো কাচের ঢাকনা দেওয়া, গোপাল পালের গড়া লক্ষ্মী আর সরস্বতী—ছোট্ট ছোট্ট আসল মানুষের মতো রঙ-করা কাপড় পরানো। দেশী কুমোরের হাতে গড়া এই খেলনা দেবতার কাছেই, দরজার উপর খাটানো চওড়া গিলটির ফ্রেমে বাঁধানো, তেল রঙ-করা বিলিতি একটা মেমের ছবি। চোখ তার কালো, চুল কটা নয় একটুও, মাথায় একটা রাঙা কানঢাকা টুপি, খয়েরী মখমলের জামা হাতকাটা, শাদা ঘাঘরা পরনে। সে বাঁহাতে একটা ঝুড়ি নিয়েছে, রুমাল ঢাকা চুবড়ির মধ্যে থেকে যেন একটা সত্যিকারের কাচের বোতল গলা বার করেছে। ডান হাত রেখেছে মেয়েটা ঠিক যেন সত্যিকার মস্ত একটা কুকুরের পিঠে! কুকুর চেয়ে আছে ঝুড়ির দিকে, মেয়েটা চেয়ে আছে কুকুরের দিকে। একেবারে জল-জীয়ন্ত মানুষ আর কুকুর আর মখমল আর ঝুড়ি আর ব্র্যানডির বোতল—কিছুতেই মনে হতো না সেটা ছবি নয়। মায়ের এই বসবার ঘরের পাশেই পশ্চিম দিকে বাবামশায়ের শোবার ঘরটা নতুন করে সাজানো হচ্ছে তখন। মস্ত একটা চাবি দিয়ে সে ঘরের দরজাটা বন্ধ রয়েছে, কিন্তু জানছি সেখানে সাহেব মিস্ত্রি লাল, শাদা, হলদে, কালো নানা রকমের বিলাতী টালি কেটে বসাচ্ছে মেঝেতে—ঠুক্‌ঠাক্ খিট্‌খাট্ ছেনির শব্দ হচ্ছেই সেখানে সারাদিন। ঘরটা যেদিন খুললো দুয়োর, সেদিন দেখি সেখানে সব ক'টা জানলা-দরজার মাথায় মাথায় সোনার জল-করা কার্নিস বসে গেছে, আর সেগুলো থেকে ফুলকাটা ফিনফিনে পর্দা জোড়া জোড়া ঝুলছে, সবজে আর সোনালি রেশমে পাকানো মোটা দড়ার ফাঁকে লটকানো। ঘরজোড়া পালঙ আয়নার মতো বার্নিশ করা। ঘরটার পশ্চিমমুখো জানলাটা খুলে তার ওধারটাতে বানিয়েছে অক্ষয় সাহা ইঞ্জিনিয়ার বাবু একটা গাছঘর, কাঠ আর টিন আর ঘষা কাচের সার্সি দিয়ে। সেখানে দেওয়ালগুলো আগাগোড়া গাছের ছালের টুকরো দিয়ে মুড়ে ভাগবত মালী লটকে দিয়েছে সব বিলিতী দামী পরগাছা! কোনোটা সাপের ফণার মতো বাঁকা, কোনোটার লম্বা পাতা দুটো সাপের খোলসের মতো ছিট্ দেওয়া ডোরাকাটা। কিন্তু এর একটা পরগাছাতেও ফুলফল কিছুই নেই, কোনোটাতে বা পাতাও নেই, কেবল সোঁটা আর কাঁটা।

এই গাছঘরের মাঝে একটা তিনফুকোর দালানের মতো খাঁচা। তারের টেবিল তাতে হলদে রঙের একজোড়া কেনেরি পাখি ধরা থাকে! শোবার ঘরটা তখনও নিজের সাজ সম্পূর্ণ করেনি ফুলদানি ইত্যাদি দিয়ে। শুধু সরু

পাথরের তাকের সঙ্গে আঁটা গোল চুল-বাঁধার আয়নাখানা মায়ের রয়েছে একটা দিকে। এই আয়নাখানাকে ঘিরে মিহি গিল্‌টির পাড়, তাতে সবজে আর শাদা মিনকারি দিয়ে নক্সাকরা জুঁইফুল আর কচি পাতার একগাছি গোড়ে মালা। আর এরই সামনে স্ফটিক কাটা চৌকোনো একটি ফুলদানির মাঝখানে সোলার বোঁটাতে আটকানো যেন বরফ কুঁচি দিয়ে গড়া ভূঁইচাপা—সোনার ডাঁটি তাকে নিয়ে ঝুঁকে পড়েছে। জলের মতো পরিষ্কার আয়নার দিকে চেয়ে ফুল দেখছে ফুলের একখানি ছায়া স্থির হয়ে!

এ-আমল সে-আমল

ঠিক কতো বয়েস তা মনে নেই কিন্তু এবারে একটা চাকর পেলেম আমি! চাকরের আসল নামটা শ্রীরামলাল কুণ্ডু, নিবাস বর্ধমান বীরভূঁই। সে কিন্তু বলতো তার নাম—ছি আম্‌নাল কুণ্ডু!

ছেলেবেলা থেকে রামলাল ছিলো আমাদের ছোটোকর্তার কাছে। ঘুমের আগে খানিক পায়ে শুড়শুড়ি না দিলে ছোটোকর্তার ঘুমই আসতো না, সেই সমস্ত ভার পেয়েছিলো রামলাল। কিন্তু কাজে টিকতে পারলে না। সকাল থেকে সন্ধ্যা একেবারে সুনিয়মে বাঁধাচালে চলতো ছোটোকর্তার কাজকর্ম সমস্তই। নিয়মের একচুল এদিক ওদিক হলে ছোটোকর্তার মেজাজ খারাপ, বুক ধড়ফড়, অনিদ্রা—এমনি নানা উৎপাত আরম্ভ হতো। চাকরদের এইসব বুঝে চলতে হতো, না হলেই তৎক্ষণাৎ বরখাস্ত! এইসব নিয়মের গোটা কতক বলি, তাহলে হয়তো বোঝা যাবে কেন রামলাল ছোটোকর্তার পদসেবা ছেড়ে ছোটোবাবু—আমার কাছে পালিয়ে এলো।

শুনেছি সেকালের বড়ো বড়ো পাথরের গোল টেবিলের বাঁকা পায়াগুলো সইতে পারতেন না ছোটোকর্তা। এক চাকরকে প্রত্যহ তোয়ালিয়া দিয়ে টেবিলের পায়া তিনটিকে ঘোমটা পরিয়ে রাখতে হতো, এবং সর্বদা নজর রাখতে হতো তোয়ালিয়া বাতাসে সরে পড়লো কিনা। হুঁকোবরদার, তার কাজই ছিলো যে প্রথমটানেই সটকা থেকে ধোঁয়া পান যেন কর্তা—একবারের বেশি দু'বার না টান দিতে হয়। দেওয়ালে বাঁকা ছবি থাকলে মুশকিল। ছেলেবেলা থেকে ছোটোকর্তার পা না টিপলে ঘুমই আসতো না, সে জন্য ছিলো বিশেষ চাকর, যার হাত পরীক্ষা করে ভর্তি করা হতো কাজে—কড়া হাত না হয়। ঘুমের আগে গল্পশোনা, সকালে খবর শোনানো—এমনি নানা কাজে নানা লোক ছিলো। সব চেয়ে শক্ত কাজ তার—যাকে বারোমাসই ছোটোকর্তার আচমনের জল দিতে হতো। কর্তার অভ্যাস ছেলেবেলা থেকেই—এক আঁজলা জল চাকরের গায়ে ছিটোতে হবে! তোপ পড়ার সঙ্গে ছোটোকর্তা একবার হাঁচবেনই, যেদিন হাঁচি এলো না সেদিন ডাক্তারের ডাক পড়লো। ছোটোকর্তার এইসব অকাট্য নিয়মের কোনটা ভঙ্গ করে যে রামলাল বরখাস্ত হয়েছিলো তা সেও বলেনি, আমিও জানিনে। রামলাল যখন এলো আমার কাছে তখন সে ছোকরা আর আমি কতো বড়ো মনেই পড়ে না, শুধু এইটুকু মনে আছে—আমি ধরা আছি তখনো আমাদের তিনতলার মাঝের হল্‌টাতে। আশপাশের ঘরগুলো থেকে পাঁচ-সাতটা ধাপ উঁচুতে এই হল্‌টা। মস্ত ছাত, বারোটা পল্‌তোলা মোটা মোটা থামের উপর ধরা, থামের মাঝে মাঝে লোহার রেলিঙ। কড়ি বরগা থাম জানলা দরজার বাহুল্য নিয়ে মস্ত ঘরটা যেন একটা অরণ্য বলে মনে হতো! সেকালের বড়ো বড়ো ঝাড় লণ্ঠন ঝোলাবার হুক আর কড়া—সেগুলোকে দেখে মনে হতো যেন সব টিকটিকি আর বাদুড় ঝুলে আছে মাথার উপরে—দিনের পর দিন একভাবেই আছে তারা!

এই অনেক দ্বার, অনেক থাম, অনেক কড়ি-বরগা, প্রাচীর আর লোহার রেলিঙ-ঘেরা স্থানটা, এর মধ্যে মস্ত খাঁচায়। ধরা ছোট্ট জীব—খাই দাই আর ঘুমোই! এই খাঁচার বাইরে কি ঘটে চলেছে, কি বা আছে, কিছুই জানার উপায় নেই! এক-একবার চারদিকের জানলা ক'টা খুলে যায়—আলো আসে, বাতাস আসে, আবার ঝুপঝাপ বন্ধ হয় জানলা—এই করেই জানি সকাল হলো, দুপুর এলো, বিকেল হলো, রাত হলো।

সম্পূর্ণ ছাড়া পাইনি তখনো আকাশের তলায়, চলতে ফিরতেও পারিনে ইচ্ছামতো। বাড়ির অন্য অংশগুলো থেকেও আলাদা করে ধরা তাই। দাসী দু'একটা কখনো কখনো বসে এসে ঘরটায়, তাদের দেশের কথা বলাবলি করে, মনিবদের গালাগালিও দেয় চুপিচুপি! একটা কালো বেড়াল, রোজই সন্ধ্যায় দেখা দেয়—কি খুঁজতে সে আসে কে জানে—এদিক-ওদিক চেয়ে আস্তে অন্ধকারে মিলিয়ে যায়! খাট-পালঙগুলো নড়ে না চড়ে না—দিনের বেলায় বালিশ আর তোশকের পাহাড় সাজিয়ে বসে থাকে, আর সন্ধ্যা হলে মশার ভন্‌ভনানির মধ্যে ধুনোর ধোঁয়াতে মশারির ঘোমটা টেনে দাঁড়িয়ে থাকে চুপচাপ। কেমন একটা ফাঁকা ফাঁকা ভাব জাগায় আমার মনে এই ঘরটা। বৈচিত্র্য নেই বললেই হয় ঘরটার মধ্যে। কল্পনা করবারও কিছু নেই এখানটায়! এই অবিচিত্র ফাঁকার মধ্যে রামলাল যখন আমাকে তার বাবু বলে স্বীকার করে নিলে তখন ভারি একটা আশ্বাস পেলেম। মনে আহ্লাদও হলো—এতোদিনে নিজস্ব কিছু পেলেম আমি! রামলাল আসার পর থেকেই বাড়ির আদব-কায়দাতে দোরস্ত হয়ে ওঠার পালা শুরু হলো আমার। একজন যে ছোটোকর্তা আছেন, তাঁর যে একটা মস্ত বাড়ি আছে অনেক মহলা, সেখানে যে পূজায় যাত্রা বসে মথুর কুণ্ডুর—এ-সব জানলেম! অমনি না-দেখা বাড়ি না-দেখা মানুষদের দিয়ে পরিচয় আরম্ভ হয়ে গেলো বাইরেটাতে আর আমাতে! এই সময়টাতেই আরব্য উপন্যাসের এক টুকরোর মতো এই তিনতলার ঘরটার আগের কথা এবং আগের ছবিটাও পেয়ে গেলাম কার কাছ থেকে তা মনে নেই। এই বাড়িটাকে সবাই ডাকে তখন 'বকুলতলার বাড়ি' বলে। শুনেছি বাড়ি ছিলো আগে একতলা বৈঠকখানা। এর দক্ষিণের বাগানে ছিলো মস্ত একটা বকুলগাছ—পাঁচপুরুষ আগে। সেই গাছের নামে বাড়িখানা 'বকুলতলার বাড়ি' বলে চলছে—আমি যখন এসেছি তখনও! এমনি ছেলেবেলায় চোখে দেখছি যে-মস্ত-হল্‌টাকে একেবারেই ফাঁক, শোনাকথার মধ্য দিয়ে কল্পনাতে সেই বাল্যকালেই দেখতে পাই হল্-ঘরটাকে সুসজ্জিত, যখন লক্ষ্মী অচলা হয়ে আছেন কর্তার কাছে দিনরাত তখনকার আমলে। সেই কালের এই হল্—হল্ বললে ঠিক ভাবটা বোঝায় না—চণ্ডীমণ্ডপ তো নয়ই—বারো দোয়ারীর কতকটা আভাস দেয়—কিন্তু ঠিক বুঝে যদি ভেবে নিই, একটা মস্ত জাহাজের ডেক, তিনতলার উপরে, জল থেকে তুলে বসিয়ে দেওয়া হয়েছে! প্রমাণের অতিরিক্ত মোটা মোটা লম্বা লম্বা কড়ি থাম জানলা—দরজা এবং আলো-হাওয়া আসবার জন্যে আবশ্যকের চেয়ে বেশি পরিমাণ ফাঁক দিয়ে প্রস্তুত আমাদের এই তিনতলার মাঝের ঘরটা। বাইরেটাকে একটুও না ঠেকিয়ে অথচ বাইরের উৎপাত রোদ, বৃষ্টি, লোকের দৃষ্টি ইত্যাদি থেকে সম্পূর্ণ আগলে অদ্ভুত কৌশলে প্রস্তুত করে গেছে ঘরখানা কোন এক সাহেব মিস্ত্রী—সেই নেপোলিয়নের আমলের অনেক আগে।

এই সাহেবকে আমি যেন দেখতে পাচ্ছি—পরচুল পরা, বেণী বাঁধা, কাঁসির মতো মস্ত গোল টুপিটা মাথায়, গায়ে খয়েরী রঙের সাটিনের কোট, পায়ে বার্নিসের জুতো বকলস দেওয়া, শর্ট প্যান্ট, হাঁটুর উপর পর্যন্ত মোজায় ঢাকা, গলায় একটা সিল্কের রুমাল ফুলের মতো ফাঁপিয়ে বাঁধা! সাহেব এসে উপস্থিত আমাদের কর্তার কাছে পাল্‌কি চড়ে! কর্তা সটকায় তখন তামাক খাচ্ছেন হাউসে যাবার পূর্বে। সাহেব মস্ত গোল

পাথরের টেবিলে মস্ত একখানা বাড়ির নক্সা মেলে ধরেছে, আর একটা পালকের কলমের উল্‌টো দিক নক্সার উপরে টেনে টেনে কর্তা সাহেবকে বোঝাচ্ছেন এ-দেশের নাচঘর, বৈঠকখানা তাওখানা প্রভৃতির সঠিক হিসাব। কর্তা বসে, সাহেব দাঁড়িয়ে। এখন হলে একটা মস্ত বেআদবি ঠেকতো, কিন্তু তখন এইটেই ছিলো চাল এবং চল। সাহেব-ইঞ্জিনিয়ার তখন লিখতো নিজের নাম ইংরিজিতে কিন্তু নিজের পেশাটা লেখা থাকতো সুন্দর বাংলায়—যেমন মিস্টার জর্জ এডওয়ার্ডস ইভস্‌ উপরে, নিচে লেখা 'গৃহনির্ম্মাণকর্ত্তা'। কর্তা ছিলেন ক্রোড়পতি ব্যবসায়ী সওদাগর এবং ঐশ্বর্যের সঙ্গে মান-মর্যাদার ইয়ত্তা ছিলো না কর্তার! সুতরাং খাশ মজলিসের স্থানটা কেমনতরো হওয়া উচিত তা যেন সাহেব মিস্ত্রী বুঝে নিয়েই করেছিলো সূত্রপাত এই তিনতলার ঘরটার। আলো, বাতাস, জাহাজ, ঘর—সমস্তকে একটা চমৎকার মতলবের মধ্যে সে ঘিরে নিয়ে বানিয়ে গেছে! এই হল্‌—ঐশ্বর্যের গৌরবের জোয়ারের চিহ্ন ধরে ধরে একতলা থেকে যখন উঠলো ক্রমে আশি ফুট উপরে তখন পৃথিবীতে আমি নেই, কিন্তু শোনা-কথার মধ্যে দিয়ে তখনকার ব্যাপার যেন স্পষ্ট দেখতে পাই! কর্তার খাশ মজলিস বসেছে রাতের বেলা আমার থেকে চারপুরুষ পূর্বে এই হল্‌টাতে।

দক্ষিণের চল্লিশফুট ফালিঘরে পড়েছে সাহেবসুবোর জন্যে রাত্রি-ভোজের টেবিল অনেকগুলো! টেবিলের উপরে চীনের বাসন থরে থরে সাজানো। সব বাসনেই সোনার জল করা রঙিন ফুলের নক্সা। প্রত্যেক বাসনে কর্তার নামের তিনটে অক্ষরের সোনালি ছাপমারা। ঝকঝক করছে রুপোর সামাদনে মোমবাতি। খানসামা সবাই জরি দেওয়া লাল বনাতের উর্দি-পরা, কোমরে একখানা করে রুমাল।

উত্তরের দিকে একটা বারান্দা—সেখানে আহারের পর আরামে বসে তামাক খাবার ব্যবস্থা রয়েছে—সেখানটাতে হুঁকোবরদার বড়ো বড়ো সোনা-রুপোর সটকাতে তামাক সেজে প্রস্তুত, বড়ো সিঁড়ির উপরে চোবদার খাড়া, আসাসোটা হাতে স্থির যেন পুতুল! মানুষ-প্রমাণ উঁচুতে থাম আর রেলিঙ ঘেরা বড়ো হল্‌—লোকলস্কর থেকে পৃথক-করা উঁচু জায়গাটা ঝাড়ে, লণ্ঠনে, বাতির আলোয় জম্‌জমাট! ঘরজোড়া প্রকাণ্ড একখানা গালিচা—ঘন লাল আর শাদা ফুলের কারিগরি তাতে।

ঘরের পুব-পশ্চিম দুটো বড়ো দেওয়ালে দু'খানা বড়ো বড়ো অয়েল পেনটিং—সাহেব ওস্তাদের আঁকা—বরবেশে এই বংশেরই এক ছেলে আর পেশওয়াজ পরা একটি মেয়ে, দুজনেই হীরে মানিক আর কিংখাবে মোড়া। এই এখন যেমন খোট্টাদের বর-সাজ তেমনি ধরনের সাজসজ্জা দুজনেরই।

গালিচার উপরে মেহগনি কাঠের বাঘ-থাবা, বাঘমুখো গঠনের কৌচ কেদারা তেপায়া, একটার মতো অন্যটা নয়! আরামে বসার জন্যেই তৈরি এইসব কৌচ কেদারায় সেই সেকালের লাট-বেলাট-সাহেব সওদাগর ও চৌরঙ্গীর বাসিন্দা—তারা বড়ো বড়ো সটকায় তামাক টানছে, আর তয়ফার নাচ দেখছে গম্ভীর হয়ে বসে! সব সাহেবই পাউডার মাখানো পরচুলধারী। হাতে রুমাল আর নস্যদানি! দু'সারি উর্দিপরা ছোকরা ক্রমান্বয়ে বড়ো বড়ে পাখার বাতাস দিচ্ছে তাদের, আর মজলিসে রুপোর সালবোটে সোনা-রূপার তবক-মোড়া পান বিলি করে চলেছে। আতরদানি গোলাপ-পাশ ফিরিয়ে চলেছে হরকরা তারা।

পাশের একটা খাশকামরা—উত্তর দক্ষিণ ও পুব তিনদিক খোলা—সেখানে কর্তার সঙ্গে মুরুব্বি সাহেব দু'চারজন বসে। সারিসারি খোলা জানলায় দেখা যায় রাতের আকাশ—যেন কারচোপের বুটি দেওয়া নীল পর্দা অনেকগুলো।

পুবের কটা জানালার ফাঁকে ফাঁকে দেখা দেয়—খালপারের নারকেল গাছের সারি, তার উপরে চাঁদ উঠেছে—যেন কানা-ভাঙা সোনার একটা আবখোরার টুকরো।

পশ্চিমের খোলা জানালায় দেখা যাচ্ছে সেকালের সওদাগরি জাহাজের মাস্তুলগুলো, ঘেঁষাঘেঁষি ভীড় করে দাঁড়িয়ে। উত্তরে—সেকালের শহর ও বাড়ির অরণ্য একটা।

যে-তিনতলার উপর উত্তর-পশ্চিম থেকে বয় গঙ্গার হাওয়া, পুব দিয়ে আসে বাদলের ঠাণ্ডা বাতাস, উত্তর জানালায় শীতের খবর আসে, দক্ষিণ বাতায়নে রহে রহে বয় সমুদ্রের হাওয়া, সেখানটাতে একটা রাত নয়—আরব্য উপন্যাসের অনেকগুলো রাতের মজলিসের আলো, সারি সারি খোলা জানালা হয়ে বাইরে রাতের গায়ে ফেলতো একটার পর একটা সোনালি আভার সোজা টান। আর সমস্ত তিনতলাটা দেখাতো যেন মস্ত একটা নৌকা অনেকগুলো সোনার দাঁড় কালো জলে ফেলে প্রতীক্ষা করছে বন্দর ছেড়ে বার হবার হুকুম ও ঘণ্টা। এ যারা তখন আশেপাশের বাড়ির ছাতে ভীড় করে দাঁড়িয়ে কর্তার মজলিসের কাণ্ডখানা সত্যি দেখেছে তাদের মুখে শোনা কথা।

আমি যখন এসেছি—তখন স্বপ্নের আমল, আরব্য উপন্যাসের যুগ বাঙলা দেশ থেকেই কেটে গেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের যুগের তখন আরম্ভ। 'গুলব কাওলী', 'ইন্দ্রসভা', 'হোমার', এ-সব বইগুলো পর্যন্ত সরে পড়বার যোগাড় করেছে—এই সময় রামলাল চাকরের সঙ্গে বসে দেখি, দুই দেওয়ালে সেই সেকালের ছবির দিকে!—বড়ো বড়ো চোখ নিয়ে ছবির মানুষ দুটি চেয়ে আছে, মুখে দু'জনেরই কেমন একটা উদাস ভাব ছবির গায়ে আঁকা। হীরে মুক্তোর জড়োয়া সাজসজ্জা যেন কতো কালের কতো দূরের বাতির আলোতে একটু একটু ঝিকমিক করছে। আমি অবাক হয়ে এখনো এই ছবি দেখি আর ভাবি কি সুন্দর দেখতেই ছিলো তখনকার ছেলেরা মেয়েরা; কি চমৎকার কত গহনায় সাজতে ভালবাসতো তারা।

কল্পনা নিয়ে থাকার সুবিধে ছিলো না তখন, কেননা রামলাল এসে গেছে এবং আমাকে পিটিয়ে গড়বার ভার নিয়ে বসেছে! বুঝিয়ে-সুজিয়ে মেরে-ধরে, এ-বাড়ির আদবকায়দা দোরস্ত করে তুলবেই আমাকে, এই ছিলো রামলালের পণ! ছোটোকর্তা ছিলেন রামলালের সামনে মস্ত আদর্শ, কাজেই এ-কালের মতো না করে, অনেকটা সেকেলে ছাঁচে ফেললে সে আমাকে—দ্বিতীয় এক ছোটোকর্তা করে তোলার মতলবে!

ছোটোকর্তা ছুরি কাঁটাতে খেতেন, কাজেই আমাকেও রামলাল মাছের কাঁটাতে ভাতের মণ্ড গেঁথে খাইয়ে সাহেবী দস্তুরে পাকা করতে চললো; জাহাজে করে বিলেত যাওয়া দরকার হতেও পারে, সে-জন্যে সাধ্যমতো রামলাল ইংরিজির তালিম দিতে লাগলো—ইয়েস নো বেরি-ওয়েল, টেক্ না টেক ইত্যাদি নানা মজার কথা। কোথা থেকে নিজেই সে একখানা বাঁশ ছুলে কাগজে কাপড়ে মস্ত একটা জাহাজ বানিয়ে দিলে আমাকে—সেটা হাওয়া পেলে পাল ভরে আপনি দৌড়োয় মাটির উপর দিয়ে। এই জাহাজ দিয়ে আর হাঁসের ডিমের কালিয়া দিয়ে ভুলিয়ে, খানিক বিলাতী শিক্ষা, সওদাগরি-ব্যবসা কারিগরি, রান্না, জাহাজ-গড়া, নৌকার ছই-বাঁধা ইত্যাদি অনেক বিষয়ে পাকা করে তুলতে থাকলো আমাকে রামলাল।

তিনতলার ঘরটায়—সেখানে বড়ো কেউ একটা আসতো না কাছে, থাকতো রামলাল তার শিক্ষাতন্ত্র নিয়ে, আর আমি তারই কাছে কখনো বসে, কখনো শুয়ে, কড়িকাঠের দিকে চেয়ে, সেকালের ঝাড় ঝোলানোর মস্ত হুকগুলো সারিসারি হেঁটমুণ্ড কিম্বাচক চিহ্ন— ¿¿¿¿¿¿ —চেয়ে দেখতো রামলালকে আমাকে মেঝের উপর সেই ঘরে। সেখান থেকে ঝাড় লণ্ঠন কার্পেট কেদারার আবরু অনেক কাল হলো সরে গেছে।

এ-বাড়ি ও-বাড়ি

কেবলি দূর থেকে জগৎটাকে দেখে চলার অবস্থাটা কখন যে পেরিয়ে গেলেম তা মনে নেই। আমাদের বাড়ির পাশেই পুরনো বাড়িতে প্রহরে প্রহরে একটা পেটা-ঘড়ি বাজতে বরাবরই। এবং ঘড়ির শব্দটাও এ-তল্লাটের সবার কানে পৌঁছতো, কেবল আমারই কাছে তখন ঘড়ির শব্দ বলে একটা কিছু ছিলো না। এমনি বাড়ির মানুষদের বেলাতেও—এপারে আমি ওপারে তাঁরা! অপরিচয়ের বেড়া কবে কেমন করে সরলো—সেটা নিজেই সরালেম কি রামলাল চাকর এসে ভেঙে ফেলে দিলে সেটা, তা ঠিক করা মুশকিল! রামলাল আসার পর থেকে অন্দরের ধরাবাঁধা থেকে ছাড়া পেলেম! বাড়ির দোতলা একতলা এবং আস্তে আস্তে ও-বাড়িতেও গিয়ে ঘুরিফিরি তখন। চোখকান হাতপা সমস্তই যখন আশেপাশের পরিচয় করে নিচ্ছে, সে-বয়েসটা ঠিক কতো হবে তা বলা শক্ত—বয়েসের ধার তখন তো বড়ো একটা ধারিনে, কাজেই কতো বয়স হলো জানবারও তাড়া ছিলো না! এই যখন অবস্থা, তখন কতকগুলো শব্দ আর রূপ একসঙ্গে, যেন দূর থেকে এসে আমার সঙ্গে পরিচয় করে নিতে চলেছে দেখি! জুতো, খড়ম খালি-পা জনে জনে রকম রকম শব্দ দেয়। তাই ধরে প্রত্যেকের আসা যাওয়া ঠিক করে চলেছি। দাসী চাকর কেউ আসছে, কেউ যাচ্ছে—কাঠের সিঁড়িতে তাদের এক এক-জনের পা এক-একরকম শব্দ দিয়ে চলেছে। এই শব্দগুলো অনেক সময় শাস্তি এড়ানোর পক্ষে খুব কাজে আসতো।

বাবামশায় লাল রঙের চামড়ার খুব পাতলা চটি ব্যবহার করতেন। তাঁর চলা এতো ধীরে ধীরে ছিলো যে অনেক সময়ে হঠাৎ সামনে পড়তেম তাঁর। একদিনের ঘটনা মনে পড়ে। সিঁড়ির পাশেই বাবামশায়ের শয়ন-ঘর, আমি সঙ্গী কাউকে হঠাৎ চমকে দেবার মতলবে দু'খানা দরজার আড়ালে লুকিয়ে আছি, এমন সময়ে দেয়ালে ছায়া দেখে একটা হুঙ্কার দিয়ে যেমন বার হওয়া, দেখি সামনেই বাবামশায়! এখনকার ছেলেদের হঠাৎ বাবা দাদা কিংবা আর কোনো গুরুজনের সামনে এসে পড়াটা দোষের নয়, কিন্তু সেকালে সেটা একটা ভয়ঙ্কর বেদস্তুর বলে গণ্য হতো। সেবারে আমার কান আমাকে ঠকিয়ে বিষম মুশকিলে ফেলেছিলো। এমনি আর একটা শব্দ পাখিরা জাগার আগে থেকেই শোবার ঘরে এসে পৌঁছতো। ভোর চারটে রাত্রে, অন্ধকারে তখন চোখদুটো কিছুই দেখছে না অথচ শব্দ দিয়ে দেখছি—সহিস ঘোড়ার গা মলতে শুরু করেছে, শব্দগুলোকে কথায় তর্জমা করে চলতো মন অন্ধকারে—গাধুস্‌নে গাধুস্‌নে, চট্‌পট্, হঠাৎ খাটখোট চাবকান্ পঠাৎ পঠাৎ, গাধুস্ গাধুস্ খাটিস্ খুটিস্ চট্‌পট্! এই রকম সহিসে ঘোড়ায়, সহিসের হাতের তেলোতে, ঘোড়ার খুরে মিলে কতকগুলো শব্দ দিয়ে ঘটনাকে পাচ্ছি। এমনি একটা গানের কথা আর সুর দিয়ে পেয়ে যেতেম সময়ে সময়ে একজন অন্ধ ভিখারীকে। লোকটি চোখের আড়ালে, কিন্তু গানটা ধরে আসতো সে নিকটে একেবারে

তিনতলায় উঠে। ভিখারীর গানের একটা ছত্র মনে আছে এখনো—'উমাগো, মা তুমি জগতের মা, ওমা কি জন্যে তুমি আমায় মা বলচো!' সন্ধেবেলায় খিড়কির দুয়োরে একটা মানুষ এসে হাঁক দেয়—'মুশকিল আসান'! কথাটার অর্থ উল্‌টো বুঝতেম—ভয়ে যেন হাতপা কুঁকড়ে যেতো; গা ছমছম করতো আর সেই সঙ্গে পাকা দাড়ি, লম্বা টুপি, ঝাপ্পা-ঝোপ্পা কাপড়-পরা ভুতুড়ে একটা চেহারা এসে সামনে দাঁড়াতো দেখতেম! বেলা তিনটের সময় একটা শব্দ—সেটা সুরেতে মানুষেতে এক সঙ্গে মিলিয়ে আসতো—'চুড়ি চাই, খেলোনা চাই'—এবারে কিন্তু মানুষটার চেয়ে পরিষ্কার করে দেখতে পেতেম—রঙিন কাচের ফুলদান, গোছাবাঁধা চুড়ি, চীনে-মাটির কুকুর বেড়াল।

বরফওয়ালার হাঁক, ফুলমালির হাঁক এমনি অনেকগুলো হাঁক-ডাক এখন শহর ছেড়ে পালিয়েছে এবং তার জায়গায় মোটরের ভেঁপু, ট্রাম-গাড়ির হুস্‌-হাস্‌, টেলিফোনের ঘণ্টা এসে গেছে শহরে!

কোন বয়েস থেকে দেখাশোনা আরম্ভ, কখনই বা শেষ সে-হিসেব বেঁচে থাকতে কষে দেখার মুশকিল আছে, তবে জনে জনে দেখা-শোনায় প্রভেদ আছে বলতে পারি। আমাদের পুরনো বাড়িতে পেটা-ঘড়িটা বাজছে যখন শুনতে পেলেম তখন তার বাজনের হিসাবে মজাটা দেখতে পেলেম। সকালে উপরো-উপরি ছ'টা সাতটা, সাড়ে সাতটা বাজিয়ে ঘড়িটা থামতো। তারপরে আটটা ন'টা দু'ঘণ্টা ফাঁক। ফের উপরো-উপরি দশ আর সাড়ে দশ বাজিয়ে স্নান আহার করে যেন ঘুম দিলে ঘড়িটা দুপুর বেলায়। উঠলো বিকেলে, চার ও পাঁচ বাজিয়ে! ঘড়ির এই রকম খামখেয়ালি চলার অর্থ তখন বুঝতেম না। সকালের ঘড়ি—ঘুম ভাঙাবার জন্যে, সাতটার ঘড়ি উপাসনার জন্যে, সাড়ে সাত হলো মাস্টার আসার, পড়তে যাবার ঘড়ি। দশ স্নানাহারের; সাড়ে দশ, ইস্কুল ও আপিশের; চার, বৈকালিক জলযোগের, কাজকর্ম ও কাছারি বন্ধের; পাঁচ, হাওয়া খেতে যাবার! ঘুমোতে যাবার ঘণ্টা একটা, দশটা কি ন'টায় বোধহয় বাজতো না—কেননা তখন ঠিক ন'টা রাত্রে কেল্লা থেকে তোপ দাগা হতো আর আমাদের বৈঠকখানায় ঈশ্বরদাদা 'বোম্‌কালী' বলে এক হুঙ্কার দিতেন, তাতেই পেটাঘড়ির কাজ হয়ে যেতো। বেলা একটার তোপ পড়লেই কর্‌কর্‌ ঘর্‌ঘর্‌ ঘড়ির চাবি ঘোরার ধুম পড়তো বাড়িতে, ও-সময়টাতেও পেটা-ঘড়ির দরকারই হতো না। এই ঘড়ির হুকুমে দেখি বাড়ির গাড়ি-ঘোড়া চাকর-বাকর ছেলেমেয়ে সবাই চলে, হাঁড়ি চড়ে হাঁড়ি নামে, মাস্টারমশাই বই বন্ধ করেন!

ও-বাড়ির এই পেটা-ঘড়িটাকে এক-একদিন দেখতে চলতেন। পুরনো বাড়ির উঠানের দাওয়ায় উঠতে বাঁ-ধারে একটা খিলেনের মাঝে ঝোলানো থাকতো ঘড়িটা! দেখতেম শোভারাম জমাদার সেখানটাতে বসে ময়দা ঠাসছে—চক্‌চকে একটা লোটা হাতের কাছেই রয়েছে, থেকে থেকে সেটা থেকে জল নিয়ে ময়দার নুটিগুলো ভিজিয়ে দিচ্ছে আর দু'হাতের চাপড়ে এক-একখানা মোটা রুটি ফস্‌ফস্‌ গড়ে ফেলছে। বেশ কাজ চলছে, এমন সময় শোভারাম হঠাৎ রুটি-গড়া রেখে, ঘড়িটাকে মস্ত একটা কাঠের হাতুড়ি দিয়ে ঘা কয়েক পিটুনি কশিয়ে কাজে বসে গেলো। দেখে দেখে আমার ইচ্ছে হতো রুটি গড়তে লেগে যাই; আবার তখনি ঘড়িটা বাজিয়ে নেবার লোভ জন্মাতো। হাতুড়িটায় হাত দেওয়া মাত্র জমাদারজী ধমকে উঠতো—নেহি, কর্তা মহারাজ খাপ্‌পা হোয়েঙ্গা!

কর্তা মহারাজ, কে তিনি, জানবার ভারি ইচ্ছে হতো। তখন কর্তাদাদামশায় দোতলার বৈঠকখানায় থাকেন, তাঁর ঘরের দরজায় কিনুসিং হরকরা—উর্দি পরে বুকে 'ওয়ার্কস্‌ উইল উইন' আর হাতির পিঠে নিশেন

চড়ানো তক্‌মা না ঝুলিয়ে, মোটা রুপোর সোঁটা হাতে টুলে বসে পাহারা দেয়, হাতে একটা পেনসিল-কাটা ছুরি, কর্তাকে সহজে দেখার উপায় নেই!

দেখতেম কর্তা পাহাড় থেকে ফিরে যে ক'দিন বাড়িতে আছেন সে ক'দিন সব যেন চুপচাপ। দারোয়ান 'হারুয়া, হারুয়া' বলে হাঁক-ডাক করতে সাহস পায় না ফটকে, গাড়িবারান্দায় গাড়ি-ঘোড়া ঢোকে বেরোয় সোয়ারি নিয়ে ধীরে ধীরে; বাবামশায়, মা, পিশি-পিশে, এ-বাড়ি ও-বাড়ির সবাই যেন সর্বদা তটস্থ। চাকর-চাকরানীদের চেঁচামেচি ঝগড়াঝাটি বন্ধ, সবাই ফিটফাট হয়ে ঘোরাফেরা করছে যেন ভালোমানুষটির মতো! এই সব দেখেশুনে কর্তার নাম হলে কেমন যেন একটু ভয়-ভয় করতো। কার্তাদাদামশায়কে একবার কাছে গিয়ে দেখে নেবার লোভ, কর্তার সামনাসামনি হয়ে তাঁর ঘরখানা দেখারও কৌতূহল থেকে থেকে জাগতো মনে! কর্তার ঘরে ঢুকতে সাহসে কুলতো না। কিন্তু চুপি চুপি ঘরের দিকে অনেক সময়ে এগিয়ে যেতেম। দারোয়ান সব সময়ে পেটা-ঘড়িকে পাহারা দিয়ে বসে থাকতো না, সিদ্ধি ঘোঁটার সময় ছিলো তার একটা। সেই একদিন-একদিন ঘড়ির সঙ্গে ভাব করতেও এগিয়ে যেতেম। পাছে ধরা পড়ি সেই ভয়ে হাতুড়ি তোলার অবসর হতো না, দুই হাতে ঘড়িটাকে চাপড় কশিয়ে দিতেম। দড়িতে বাঁধা ঘড়ি লাটিমের মতো ঘুরতে থাকতো, যেন একঝাঁক ভীমরুলের মতো গুমরে উঠতো রেগে। ঘড়ির শব্দ আকস্মিক একটা ভয় লাগাতো—কর্তা বুঝি শুনলেন, দারোয়ান এলো বুঝি-বা। ঘড়ির কাছে থাকা নিরাপদ নয় জেনে এক ছুটে আমাদের তিনতলার ঘরে হাজির হতেম; তারপর সারাক্ষণ যেন দেখতেম দারোয়ান কর্তার কাছে আমার নামে নালিশ করছে; সঙ্গে সঙ্গে কর্তা ডাকলে কি কি মিছে কথা বলতে হবে তার ফর্দ একটাও তৈরি করে চলতো মন তখন।

কর্তামশায় সব সময়ে বাড়িতে থাকেন না—বোলপুরে যান, সিমলের পাহাড়ে যান—আবার হঠাৎ একদিন কাউকে কিছু না বলে ফিরে আসেন। হঠাৎ নামেন কর্তা গাড়ি থেকে ভোরে, দারোয়ানগুলো ধড়মড় করে খাটিয়া ছেড়ে উঠে পড়ে, এ-বাড়ি ও-বাড়ি সাড়া পড়ে যায়—কর্তা এসেছেন! এই সময়টাও দেখতেম—আমাদের বৈঠকখানায় দু'বেলা গানের মজলিস খুব আস্তে চলেছে। কাছারি বসছে নিয়মিত দশটা-চারটে। দক্ষিণের বাগানে বৈকালে বিশ্বেশ্বর হুঁকোবরদার বড়ো বড়ো রুপোর আর কাচের সটকাগুলো বার করে দেয় না। বিলিয়ার্ড-রুমে আমাদের কেদারদাদার হাঁকডাক একেবারে বন্ধ। যত সব গম্ভীর লোক, তাঁরা পুরনো বাড়িতে সকাল-সন্ধ্যা আসা-যাওয়া করেন—কেউ গাড়িতে, কেউ বা হেঁটে। আমাদের উপর হুকুম আসে যেন গোলমাল না হয়, কর্তা শুনতে পাবেন। চাকরগুলো কড়া নজর রাখে—খালি পা, কি ময়লা কাপড়ে আছি কিনা। পাঠান কুস্তিগীর ক'জন খুব কষে মাটি মেখে নিয়মিত কসরত করতে লেগে যায়। বুড়ো খানসামা গোবিন্দ, সেও ভোরে ভোরে উঠে কর্তার জন্য দুধ আনতে গোয়াল ঘরে গিয়ে ঢোকে!

এই গোবিন্দ ছিলো কর্তার চাকর। এর একটা মজার কাহিনী মনে পড়ছে। ভোরে উঠে গোবিন্দ কর্তার জন্যে দুধ নিয়ে ফিরছে, ঠিক সেই সময় পথ আগলে পাঠান সর্দার দুটো কুস্তি লাগিয়েছে। গোবিন্দ যত বলে পথ ছাড়তে, পাঠান তারা কানই দেয় না। পাঠান নড়ে না দেখে, গোবিন্দ একটু চটে উঠে অথচ গলার সুর খুব নরম করে বলে—'পাঠান ভাই, রাস্তা ছাড়ো! শুনতা, ও পাঠান ভাই! দেখ, পাঠান ভাই, কাঁদের ওপোর ছাগল নাপাতা হ্যায়, হাতে দুধের ঘট্টে হ্যায়, দুধটা পড়ে যাবে তো জবাবদিহি করবে কে?'

কর্তা বাড়ি এলে বাড়ি দুটো ঢিলেঢালা ঝিমন্ত ভাব ছেড়ে বেশ যেন সজাগ হয়ে উঠতো। আবার একদিন দেখতেম কর্তা কখন চলে গেছেন, বাড়ির সেই আগেকার ভাবটা ফিরে এসেছে। দারোয়ান হাঁকাহাঁকি শুরু করেছে, আমাদের ছীরে মেথরে আর বুড়ো জমাদারে বিষম তকরার বেধেছে। জমাদার লাঠি নিয়ে যত ঝেঁকে ওঠে, ছীরে মেথর ততই নরম হয়। জমাদারের দুই পা জড়িয়ে ধরবে এমনি ভাবটা দেখায়। তখন জমাদারজী রণে ভঙ্গ দিয়ে তফাতে সরেন, ছীরেও বুক ফুলিয়ে বাসায় গিয়ে ঢুকে তার বৌটাকে প্রহার আরম্ভ করে। আরো চেঁচামেচি বেধে যায়। ওদিকে দাসীতে দাসীতে ঝগড়া—তাও শুরু হয় অন্দরে। বৈঠকখানাতে গানের মজলিস জাঁকিয়ে অক্ষয়বাবু গলা ছাড়েন। আমাদেরও হুটোপাটি আরম্ভ হয়ে যায়! কর্তা না থাকলে বাঁধা চালচোল এমনি আল্‌গা হয়ে পড়ে যে, মনে হয়, ঘড়িতে হাতুড়ি পিটিয়ে চললেও দারোয়ান কিছুই বলবে না! কর্তার গাড়ি ফটক পেরিয়ে যাওয়া মাত্র, ইস্কুল থেকে ছুটি-পাওয়া গোছের হয়ে পড়তো বাড়ির এবং বাড়ির সকলের ভাবটা।

শীতকালে যেবারে কর্তাদাদামশায় বাড়ি থাকতেন সেবারে মাঘোৎসব খুব জাঁকিয়ে হতো! একটা উৎসবের কথা মনে আছে একটু—সেবারে সঙ্গীতের আয়োজন বিশেষ ভাবে করা হয়েছিলো। হায়দারাবাদ থেকে মৌলাবক্স সেবারে জলতরঙ্গ বাজনা এবং গান করতে আমন্ত্রিত হন।

সকাল থেকে বাড়ি গাঁদা ফুল, দেবদারু-পাতা, লাল বনাত, ঝাড় লণ্ঠন, লোকজন, গাড়ি-ঘোড়াতে গিস্‌গিস্‌ করছে। আমাদের মুখে এককথা—মৌলাবাক্‌সোর বাজনা হবে! সকাল থেকেই খানিক সিন্দুক, খানিক বাক্‌সো মিলিয়ে একটা অদ্ভুত গোছের মানুষের চেহারা যেন চোখে দেখতে থাকলেম। এখনকার মতো তখন টিকিট হতো না—নিমন্ত্রণ-পত্র চলতো বোধহয়।

ছেলেদের পক্ষে উৎসব সভাতে হঠাৎ যাওয়া হুকুম না পেলে অসম্ভব ছিলো, অথচ মৌলাবাক্‌সোর গান না শুনলেও নয়। কাজেই হুকুমের জন্য দরবার করতে ছোটা গেলো সকালে উঠেই। আমাদের ছোট্টখাটো দরবার শোনাতে এবং শুনে তার একটা বিহিত করতে ছিলেন ও-বাড়ির বড়ো পিশেমশায়। কিন্তু তাঁর কাছ থেকে সাফ জবাব পাওয়া মুশকিল হলো সেদিন। 'দেখবো—দেখবো' বলে তিনি আমাদের বিদায় দিলেন, তারপর সারাদিন তাঁর আর উচ্চবাচ্য নেই।

উৎসবে যাওয়া কি না-যাওয়ার বিষয়ে যখন না-যাওয়াই স্থির হয়ে গেছে নিজের মনে, তখন রামলাল চাকর এসে বললে—'হুকুম হয়েছে, চটপট কাপড় ছেড়ে নাও!' এখনো টিকিটের দরবারে ছোকরাদের ও-বাড়ির দরজায় যখন ঘুর-ঘুর করতে দেখি তখন আমার সেই দিনটার কথাই মনে আসে!

মৌলাবাক্‌সোকে একটা অদ্ভুতকর্মা গোছের কিছু ভেবেছিলেম—জলতরঙ্গ কালোয়াতী গানের ভালোমন্দ বিচার শক্তি ছিলোই না তখন, কিন্তু মৌলাবাক্‌সো দেখে হতাশ হয়েছিলেম মনে আছে। তার চেয়ে গান-বাজনা, লোকের ভিড়, ঝাড় লণ্ঠন, সবার উপরে তিনতলার ঘরে কর্তাদিদিমার দেওয়া গরম-গরম লুচি, ছোকা, সন্দেশ, মেঠাই-দানা, ঢের ভালো লেগেছিলো আমার মনে আছে। প্রায় পনেরো আনা শ্রোতাই তখন মাঘোৎসবের ভোজ আর পোলাও মেঠাই খেতেই আসতো আমার মতো। মস্ত মস্ত মেঠাই, ছোটোখাটো কামানের গোলার মতো, নিঃশেষ হতো দেখতে দেখতে। পরদিনও আবার কর্তাদিদিমার লোক এসে একথালা মেঠাই দিয়ে যেতে ছেলেদের খাবার জন্যে।

কর্তাদিদিমা আর বড়োমা—শাশুড়ি আর বৌ—দুজনেই সমান চওড়া লাল-পেড়ে শাড়ি পরে আছেন। বড়োমা-র মাথায় প্রায় আধহাত ঘোমটা, কিন্তু কর্তাদিদিমার মাথা অনেকখানি খোলা—সিঁদুর জ্বল্‌জ্বল্‌ করছে দেখে ভারি নতুন ঠেকছিলো।

এই মাঘোৎসবে ভোজের বিরাট রকম আয়োজন হতো তিনতলা থেকে একতলা! সকাল থেকে রাত একটা দুটো প্রর্যন্ত খাওয়ানো চলতো। লোকের পর লোক, চেনা, অচেনা, আত্মপর, যে আসছে খেতে বসে যাচ্ছে। আহারের পর বেশ করে হাত মুখ ধুয়ে, পান ক'টা পকেটে লুকিয়ে নিয়ে, মুখ মুছতে মুছতে সরে পড়ছে—পাছে ধরা পড়ে অন্যের কাছে এরা সবাই। মাঘোৎসবের ভোজ আর মেঠাই, অনেকে খেয়ে বাইরে গিয়ে খাওয়াদাওয়া ব্যাপারটা সম্পূর্ণ অস্বীকার করেও চলেছে এও স্বকর্ণে শুনেছি, তখনকার লোকের মুখেও শুনতেম।

মাঘোৎসবের লোকারণ্যের মাঝখানে কর্তাকে পরিষ্কার করে দেখে নেওয়া মুশকিল ছিলো আমার পক্ষে! অনেকদিন পরে একবার কর্তাদাদামশায়কে সামনাসামনি দেখে ফেললেম। সকালবেলায় উত্তরের ফটকের রেলিঙগুলোতে পা রেখে ঝুল দিচ্ছি এমন সময় হঠাৎ কর্তার গাড়ি এসে দাঁড়ালো।

লম্বা চাপকান, জোব্বা, পাগড়ি পরে কর্তা নামছেন দেখেই দৌড়ে গিয়ে প্রণাম করে ফেললেম। ভারি নরম একখানা হাতে মাথাটাকে আমায় ছুঁয়েই কর্তা উপরে উঠে গেলেন।

বাড়িতে তখন খবর হয়ে গেছে—কর্তামশায় চীনদেশ থেকে ফিরেছেন। আমি যে কর্তাকে দেখে ফেলেছি, প্রণামও করেছি, সব আগেই সেটা মায়ের কানে গেলো। ময়লা কাপড়ে কর্তার সামনে গিয়ে অন্যায় করেছি বলে একটু ধমকও খেলেম, আর তখনি রামলাল এসে আমাকে ধরে পরিষ্কার কাপড় পরিয়ে ছেড়ে দিলে। এই হঠাৎ-দেখার কিছুক্ষণ পরে, কর্তার কাছ থেকে আমাদের সবার জন্য একটা-একটা চীনের বার্নিশ করা চমৎকার কৌটো এসে পড়লো, তার সঙ্গে গোটাকতক বীরভূমের গালার খেলনা।

আমার বাক্সটা ছিলো রুহীতনের আকার, তার উপরে একটা উড়ন্ত পাখি আঁকা। আর গালার খেলনাটা ছিলো একটা মস্ত গোলাকার কচ্ছপ।

এর পরেই মা আর আমার দুই পিশির জন্যে, হাতির দাঁতের নৌকা আর সাততলা চীনদেশের মন্দির, কর্তার কাছ থেকে বাবামশায় নিয়ে এলেন। চীনের সাততলা মন্দিরটার কি চমৎকার কারিগরিই ছিলো! ছোট্ট ছোট্ট ঘণ্টা ঝুলছে, হাতির দাঁতের টবে হাতির দাঁতেরই গাছ, মানুষ সব দাঁতে তৈরি, এক-এক তলায় গম্ভীরভাবে যেন উঠা-নামা করছে। সেই মন্দিরের একটা-একটা তলা দেখে চলতে একটা-একটা বেলা কেটে যেতো আমার। তারপর একটু বড়ো হয়ে সেটাকে টুকরো-টুকরো করে ভেঙে দেখতে লেগে গেলেম—সেদিনও মন্দিরের দু'একটা টুকরো ছিলো বাক্সে!

এর পরে কর্তাকে দেখেছিলেম ছেলেবেলাতে আর একবার। ও-বাড়ি থেকে শোভাযাত্রা করে বর বার হলো—এখনকার মতো বর-যাত্রা নয়—বর চললো খড়খড়ি দেওয়া মস্ত পাল্‌কিতে, আগে ঢাক ঢোল, পিছনে কর্তাকে ঘিরে আত্মীয় বন্ধুবান্ধব, সঙ্গে অনেকগুলো হাতলণ্ঠন আর নতুন রঙ-করা কাপড় পরে চাকর দারোয়ান পাইক। সদর ফটক পর্যন্ত কর্তা সঙ্গে গেলেন, তারপর বরের পাল্‌কি চলে গেলে কর্তা উপরে গেলেন, গায়ে লালজরির জামেওয়ার, পরনে গরদের ধুতি।

বারবাড়িতে

সেকালের নিয়ম অনুসারে একটা বয়েস পর্যন্ত ছেলেরা থাকতেম অন্দরে ধরা, তারপর একদিন চাকর এসে দাসীর হাত থেকে আমাদের চার্জ বুঝে নিতো। কাপড় জুতো জামা বাসন-কোসনের মতো করে আমাদের তোষাখানায় নামিয়ে নিয়ে ধরতো; সেখান থেকে ক্রমে দপ্তরখানা হয়ে হাতেখড়ির দিনে ঠাকুরঘর, শেষে বৈঠকখানার দিকে আস্তে আস্তে প্রমোশন পাওয়া নিয়ম ছিলো। রামলাল যতোদিন আমার চার্জ বুঝে নেয়নি ততোদিন আমি ছিলেম তিনতলায় উত্তরের ঘরে! সেইকালে একবার একটা সূর্যগ্রহণ লাগলো—থালায় জল রেখে সূর্য দেখে পুণ্য কাজ করে ফেলেছিলেম সেদিন। মনে পড়ে সেই প্রথম একলা ছাতে বার হয়ে আকাশ দেখলেম—নীল পরিষ্কার আকাশ। তারই গায়ে সারি সারি নারকেল গাছ, পুবদিক জুড়ে মস্ত একটা বটগাছ, তারই তলায় একটা পুকুর—আমাদের দক্ষিণের বাগানের এইটুকুই চোখে পড়লো সেইদিন। এই দক্ষিণের বাগান ছিলো বারবাড়ির সামিল—বাবুদের চলাফেরার স্থান। এখন যেমন ছেলেপিলে দাসী চাকর রাস্তার লোক এবং অন্দরের মেয়েরা পর্যন্ত এই বাগান মাড়িয়ে চলাফেরা করে, সেকালে সেটি হবার জো ছিলো না! বাবামশায়ের শখের বাগান ছিলো এটা—এখানে পোষা সারস পোষা ময়ূর—তারা কেউ হাঁটু জলে পুকুরে নেমে মাছ শিকার করতো, কেউ প্যাখম ছড়িয়ে ঘাসের উপর চলাফেরা করতো। তিন-চারটে উড়ে মালিতে মিলে এখানে সব শখের গাছ আর খাঁচার পাখিদের তদবির করে বেড়াতো, একটি পাতা কি ফুল ছেঁড়ার হুকুম ছিলো না কারু! এই বাগানে একটা মস্ত গাছ-ঘর—সেখানে দেশ-বিদেশের দামী গাছ ধরা থাকতো! পদ্ম ফুলের মতো করে গড়া একটা ফোয়ারা—তার জলে লাল মাছ, সব আফ্রিকা দেশ থেকে আনানো, নীল পদ্মপাতার তলায় খেলে বেড়াতো! বাড়িখানা একতলা দোতলা তিনতলা পর্যন্ত, পাখিতে গাছেতে ফুলদানিতে ভর্তি ছিলো তখন। মনে পড়ে দোতলায় দক্ষিণের বারান্দার পুবদিকে একটা মস্ত গামলায় লাল মাছ ঠাসা থাকে, তারই পাশে দুটো সাদা খরগোশ, জাল-ঘেরা মস্ত খাঁচার সব ছোটো ছোটো পোষা পাখির ঝাঁক, দেওয়ালে একটা হরিণের শিঙের উপর বসে লালঝুঁটি মস্ত কাকাতুয়া, শিকলি-বাঁধা চীন দেশের একটা কুকুর, নাম তার কামিনী—পাউডার এসেন্সের গন্ধে কুকুরটার গা সর্বদা ভুরভুর করে। তখন বেশ একটু বড়ো হয়েছি, কিন্তু বৈঠকখানার বারান্দায় ফস্ করে যাবার সাধ্য নেই, সাহসও নেই! এখন যেমন ছেলেমেয়েরা 'বাবা' বলে হুট্ করে বৈঠকখানায় এসে হাজির হয় তখন সেটা হবার জো ছিলো না। বাবামশায় যখন আহারের পরে ও-বাড়িতে কাছারি করতে গেছেন সেই ফাঁকে এক-একদিন বৈঠকখানায় গিয়ে পড়তেম। 'টুনি' বলে একটা ফিরিঙ্গী ছেলেও এই সময়টাতে পাখি চুরি করতে এদিকটাতে আসতো। পাখিগুলোকে খাঁচা খুলে উড়িয়ে দিয়ে, জালে করে ধরে নেওয়া খেলা ছিলো তার! টুনিসাহেব একবার একটা দামী পাখি উড়িয়ে

দিয়ে পালায়। দোষটা আমার ঘাড়ে পড়ে। কিন্তু। সেবারে আমি টুনির বিদ্যে ফাঁস করে দিয়ে রক্ষে পেয়ে যাই। আর একদিন—সে তখন গরমির সময়—দক্ষিণ বারান্দাটা ভিজে খসখসের পরদায় অন্ধকার আর ঠাণ্ডা হয়ে আছে; গামলা ভর্তি জলে পদ্মপাতার নিচে লাল মাছগুলোর খেলা দেখতে দেখতে মাথায় একটা দুর্বুদ্ধি জোগালো। যেমন লালমাছ, তেমনি লাল জলেই খেলে বেড়ালে শোভা পায়! কোথা থেকে খানিক লাল রঙ এনে জলে গুলে দিতে দেরি হলো না, জলটা লালে লাল হয়ে উঠলো। কিন্তু মিনিট কতকের মধ্যেই গোটা দুই মাছ মরে ভেসে উঠলো দেখেই বারান্দা ছেড়ে চোঁ চোঁ দৌড়—একদম ছোটোপিশির ঘরে! মাছ মারার দায় থেকে কেমন করে, কি ভাবে যে রেহাই পেয়েছিলাম তা মনে নেই, কিন্তু অনেকদিন পর্যন্ত আর দোতলায় নামতে সাহস হয়নি।

মনে আছে আর একবার মিস্ত্রী হবার শখ করে বিপদে পড়েছিলেম। বাবামশায়ের মনের মতো করে চীনে মিস্ত্রীরা চমৎকার একটা পাখির ঘর গড়ছে—জাল দিয়ে ঘেরা একটা যেন মন্দির তৈরি হচ্ছে, দেখছি বসে বসে। রোজই দেখি, আর মিস্ত্রীর মতো হাতুড়ি পেরেক অস্ত্রশস্ত্র চালাবার জন্য হাত নিস্‌পিস্ করে। একদিন, তখন কারিগর সবাই টিফিন করতে গেছে, সেই ফাঁকে একটা বাটালি আর হাতুড়ি নিয়ে মেরেছি দু'তিন কোপ! ফস্ করে বাঁ হাতের বুড়ো আঙুলের ডগায় বাটালির এক ঘা! খাঁচার গায়ে দু'চার ফোঁটা রক্ত গড়িয়ে পড়লো। রক্তটা মুছে নেবার সময় নেই—তাড়াতাড়ি বাগান থেকে খানিক ধুলো-বালি দিয়ে যতোই রক্ত থামাতে চলি ততোই বেশি করে রক্ত ছোটে! তখন দোষ স্বীকার করে ধরা পড়া ছাড়া উপায় রইলো না। সেবারে কিন্তু আমার বদলে মিস্ত্রী ধমক খেলে—যন্ত্রপাতি সাবধানে রাখার হুকুম হলো তার উপর! কারিগর হতে গিয়ে প্রথমে যে ঘা খেয়েছিলেম তার দাগটা এখনো আমার আঙুলের ডগা থেকে মেলায়নি। ছেলেবেলায় আঙুলের যে-মামলায় পার পেয়ে গিয়েছিলেম, তারই শাস্তি বোধ হয় এই বয়সে লম্বা আঙুল এঁকে শুধতে হচ্ছে সাধারণের দরবারে।

আর একটা শাস্তির দাগ এখনো আছে লেগে আমার ঠোঁটে। গুড়গুড়িতে তামাক খাবার ইচ্ছে হলো—হঠাৎ কোথা থেকে একটা গাড় যোগাড় করে তারই ভিতর খানিক জল ভরে টানতে লেগে গেলাম। ভুড় ভুড় শব্দটা ঠিক হচ্ছে, এমন সময় কি জানি পায়ের শব্দে চমকে যেমন পালাতে যাওয়া, অমনি শখের হুঁকোটার উপর উল্‌টে পড়া! সেবার নীলমাধব ডাক্তার এসে তবে নিস্তার পাই—অনেক বরফ আর ধমকের পরে। দেখেছি। যখন দুষ্টুমির শাস্তি নিজের শরীরে কিছু না কিছু আপনা হতেই পড়েছে, তখন গুরুজনদের কাছ থেকে উপরি আরো দু'চার ঘা বড়ো একটা আসতো না। যখন দুষ্টুমি করেও অক্ষত শরীরে আছি তখনই বেত খেতে হতো, নয় তো ধমক, নয় তো অন্দরে কারাবাস। এই শেষের শাস্তিটাই আমার কাছে ছিলো ভয়ের—কুইনাইন খাওয়ার চেয়ে বিষম লাগতো!

অন্দরে বন্দী অবস্থায় যে ক'দিন আমার থাকতে হতো, সেক'দিন ছোটোপিশির ঘরই ছিলো আমার নিঃশ্বাস ফেলবার একটিমাত্র জায়গা। 'বিষবৃক্ষ' বইখানাতে সূর্যমুখীর ঘরের বর্ণনা পড়ি আর মনে আসে ছোটোপিশির ঘর। তেমনি সব ছবি, দেশী পেন্টারের হাতের। 'কৃষ্ণকান্তের উইল'-এ যে লোহার সিন্দুকটা, সেটাও ছিলো। কৃষ্ণনগরের কারিগরের গড়া গোষ্ঠলীলার চমৎকার একটি কাচ-ঢাকা দৃশ্য, তাও ছিলো। উলে বোনা পাখির ছবি, বাড়ির ছবি। মস্ত একখানা খাট—মশারিটা তার ঝালরের মতো করে বাঁধা। শকুন্তলার ছবি, মদনভস্মের ছবি, উমার তপস্যার ছবি, কৃষ্ণলীলার ছবি দিয়ে ঘরের দেওয়াল ভর্তি। এক-একটা ছবির দিকে চেয়ে-চেয়েই

দিন কেটে যেতো। এই ঘরে জয়পুরী কারিগরের আঁকা ছবি থেকে আরম্ভ করে, অয়েল পেনটিং ও কালীঘাটের পট পর্যন্ত সবই ছিলো; তার উপরেও, এক আলমারি খেলনা। কালো কাচের প্রমাণসই একটা বেড়াল, শাদা কাচের একটা কুকুর, ঠুনকো একটা ময়ূর, রঙিন ফুলদানি কত রকমের! সে যেন একটা ঠুনকো রাজত্বে গিয়ে পড়তেম! এ-ছাড়া একটা আলমারি, তাতে সেকালের বাংলা-সাহিত্যের যা-কিছু ভালো বই সবই রয়েছে। এই ঘরের মাঝে ছোটোপিশি বসে বসে সারাদিন পুঁতি-গাঁথা আর সেলাই নিয়েই থাকেন। বাবামশায় ছোটোপিশিকে সাহেব-বাড়ি থেকে সেলাইয়ের বই, রেশম, কতো কি, এনে এনে দিতেন আর তিনি বই দেখে দেখে নতুন নতুন সেলাইয়ের নমুনা দিয়ে কতো কি কাজ করতেন তার ঠিক নেই! ছোটোপিশি এক জোড়া ছোট্ট বালা পুঁতি গেঁথে গেঁথে গড়েছিলেন—সোনালি পুঁতির উপরে ফিরোজার ফুল বসানো ছোট্ট বালা দু'গাছি, সোনার বালার চেয়েও ঢের সুন্দর দেখতে।

বিকেলে ছোটোপিশি পায়রা খাওয়াতে বসতেন। ঘরের পাশেই খোলা ছাত; সেখানে কাঠের খোপে, বাঁশের খোপে, পোষা থাকতো লক্কা, সিরাজী, মুক্ষি কতো কী নামের আর চেহারার পায়রা। খাওয়ার সময় ডানায় ও পালকে ছোটোপিশিকে ঘিরে ফেলতে পায়রাগুলো।

সে যেন সত্যি সত্যিই একটা পাখির রাজত্ব দেখতেম—উঁচু পাঁচিল-ঘেরা, ছাতে ধরা। বাবামশায়েরও পাখির শখ ছিলো, কিন্তু তাঁর শখ দামী দামী খাঁচার পাখির, ময়ূর, সারস, হাঁস এই সবেরই। পায়রার শখ ছিলো ছোটোপিশির। হাটে-হাটে লোক যেতো পায়রা কিনতে। বাবামশায় তাঁকে দুটো বিলিতী পায়রা এক সময়ে এনে দেন, ছোটোপিশি সে দুটোকে ঘুঘু বলে স্থির করেন, কিছুতেই পুষতে রাজী হন না। অনেক বই খুলেও বাবামশায় যখন প্রমাণ করতে পারলেন না যে পাখি দুটো ঘুঘু নয়, তখন অগত্যা সে দুটো রটলেজ সাহেবের ওখানে ফেরত গেলো! এরই কিছুদিন পরে একটা লোক ছোটোপিশিকে এক জোড়া পায়রা বেচে গেলো—পাখি দুটো দেখতে ঠিক শাদা লাক্কা, কিন্তু লেজের পালক তাদের ময়ূরপুচ্ছের মতো রঙিন। এবার ছোটোপিশি ঠকলেন—বাবামশায় এসেই ধরে দিলেন পায়রার পালকে ময়ূরপুচ্ছ সুতো দিয়ে সেলাই করা। একটা তুমুল হাসির হর্‌রা উঠেছিলো সেদিন তিনতলার ছাতে, তাতে আমরাও যোগ দিয়েছিলেম।

ঠাকুরপুজো, কথকতা, সেলাই আর পায়রা—এই নিয়েই থাকতেন ছোটোপিশি। একবার তাঁর তিনতলার এই ছাতটাতে, বাড়িসুদ্ধ সবার ফোটো নিতে এক মেম এসে উপস্থিত হলো। আমাদেরও ফোটো নেবার কথা, সকাল থেকে সাজগোজের ধুমধাম পড়ে গেলো। সেইদিন প্রথম জানলেম আমার একটা হাল্‌কা নীল মখমলের কোট-প্যান্ট আছে। ভারি আনন্দ হলো, কিন্তু গায়ে চড়বামাত্রই কোট-প্যান্ট বুঝিয়ে দিলো যে আমার মাপে তাদের কাটা হয়নি। এই অদ্ভুত সাজ পরে আমার চেহারাটা কারু কারু অ্যালবামে এখনো আছে—রোদের ঝাঁজ লেগে চোখ দুটো পিটপিট করছে, কাপড়টা ছেড়ে ফেলতে পারলে বাঁচি এই ভাব।

ফোটো তোলা আর বাড়ির প্ল্যান আঁকার কাজ জানতেন বাবামশায়। ড্রইং করার নানা সাজ-সরঞ্জাম, কম্পাস-পেনসিল কত রকমের দেখতেম তাঁর ঘরে। বাবামশায় কাছারির কাজে গেলে তাঁর ঘরে ঢুকে সেগুলো নেড়ে-চেড়ে নিতেম। ঠিক সেই সময়, ফার্সি পড়ানোর মুন্সি এসে জুটতেন। কথায় কথায় তিনি আলে বে, পে, তে, জিম—এমনি ফার্সি অক্ষর আমাদের শোনাতে বসতেন। মুন্সির দু'একটা বয়েৎ এখনো মনে আছে—'গুলেস্তাঁমে যাকে হরিয়েক গুলকো দেখা, না তেরি সে রঙ্গ, না তেরি সে বূ হ্যায়'। আরেকটা বয়েৎ ছিলো সেটা ভুলে গেছি, কেবল ধ্বনিটা মনে আছে।—কবুতর্ বা কবুতর বাক্ বাবাজ! সেকালে ফার্সি পড়িয়ে হলে

কানে শরের কলম আর লুঙ্গি না হলে চলতো না, মাথাও ঢাকা চাই! ঠিক মনে পড়ে না কেমন সাজটা ছিলো মুন্সির।

ডাক্তারবাবুর আসবার সময় ছিলো সকাল ন'টা। অসুখ থাক বা না থাক, কতকটা সময় বাইরে বসে গল্প গুজব করে তবে অন্যত্র রোগী দেখতেন গিয়ে রোজই। সেখানেও হয়তো এমনি একটা বাঁধা টাইম ছিলো ডাক্তারের জন্যে পান জল তামাক ইত্যাদি নিয়ে! আর এক ডাক্তারসাহেব ছিলো বরাদ্দ—তার নাম কেলি—সে রোজ আসতো না, কিন্তু যখন আসতো তখনি জানতেম বাড়িতে একটা শক্ত রোগ ঢুকেছে। তখন দেখতুম আমাদের নলিমাধব বাবুর মুখটা গম্ভীর হয়ে উঠেছে, আর ইংরিজি কথাটার মাঝে মাঝে থেকে থেকে 'ওর নাম কি' কথাটা অজস্র ব্যবহার করছেন তিনি; যথা—'আই থিংক—ওর নাম কি—ডিজিটিলিস্ এণ্ড কোয়নাইন ওর নাম কি—ইফ ইউ প্রেফার আই সে ডক্টার কেলি ইত্যাদি।'

সাহেব ছাড়া হয়ে নীলমাধববাবু—তাঁকে ডাক্তারই মনে হতো না, মনে হতো, একেবারে ঘরের মানুষ আর মজার মানুষটি! বাঘমুখো ছড়ি হাতে, গলায় চাদর, বুকে মোটা সোনার চেইন, ডাক্তারবাবু ভালোমানুষের মতো এসে একখানা বেতের চৌকিতে বসতেন। চৌকিখানা আসতে তাঁর সঙ্গে সঙ্গেই আবার সরেও যেতো তাঁর সঙ্গেই। আমার প্রায়ই অসুখ ছিলো না, কাজেই ডাক্তারের লাঠিটার বাঘমুখ কেমন করে কাত হয়ে চাইছে সেইটেই দেখতে পেতেম। ছোটো ছোটো লাল মানিকের চোখ দুটো বাঘের—ইচ্ছে হতো খুঁটে নিই, কিন্তু ভয় হতো—মা আছেন কাছেই দাঁড়িয়ে ডাক্তারের। এখনকার কালে কতো ওষুধেরই নাম লেখে একটু অসুখেই, তখন সাতদিন জ্বর চললো তো দালচিনির আরক দেওয়া মিকশ্চার আসতো—বেশ লাগতো খেতে, আর খেলেই জ্বর পালাতো। তিনদিন পর্যন্ত ওষুধ লেখাই হতো না কোনো—হয় সাবুদানা, নয় এলাচদানা, বড়ো জোর কিটিং-এর বন্‌বন্। তিনদিনের পরেও যদি উঠে না দাঁড়াতেম তবে আসতো ডাক্তারখানা থেকে রেড মিকশ্চার। গলদা চিংড়ির ঘি বলে সেটাকে সমস্তটা খাইয়ে দিতে কষ্ট পেতে হতো মাকে।

এখন নানা রকম শৌখিন ওষুধ বেরিয়েছে, তখন মাত্র একটি ছিলো শৌখিন ওষুধ, যেটা খাওয়া চলতো অসুখ না থাকলেও। এই জিনিসটি দেখতে ছিলো ঠিক যেন মানিকে গড়া একটি একটি রুহীতনের টেক্কা। নামটাও তার মজার-জুজুবস্। এখন বাজারে সে জুজুবস্ পাওয়া যায় না, তার বদলে ডাক্তারখানায় রাখে যষ্ঠিমধুর জুজুবস্—খেতে অত্যন্ত বিস্বাদ। অসুখ হলে তখন ডাক্তারের বিশেষ ফরমাসে আসতো এক টিন বিস্কুট আর দমদম মিছরি। এখনকার বিস্কুটগুলা দেখতে, হয় টাকা, নয় টিকিট। তখন ছিলো তারা সব কোনোটা ফুলের মতো, কেউ নক্ষত্রের মতো, কতক পাখির মতো। দমদম মিছরিগুলো যেন সোনার থেকে নিঙড়ে নেওয়া, রসে ঢালাই করা মোটা স্ক্ব একটা-একটা।

ডাক্তারের পরই—ঠন্‌ঠনের চটি পায়ে, সভ্যভব্য চন্দ্র কবিরাজ—তিনি তোষাখানা থেকে দপ্তরখানা হয়ে, লাল রঙের বগলী থেকে চটী বিলি করে করে উঠে আসতেন তেতলায় আমাদের কাছে। নাড়ি টিপে বেড়ানোই ছিলো তাঁর একমাত্র কাজ, কিন্তু নিত্য-কাজ। বুড়ো কবিরাজ আমার মাকে মা বলে যে কেন ডাকে তার কারণ খুঁজে পেতেম না।

আর একটি-দুটি লোক আসতো উপরের ঘরে, তাদের একজন গোবিন্দ পাণ্ডা, আর একজন রাজকিষ্ট মিস্ত্রী।

পাণ্ডা আসতো কামানো মাথায় নামাবলি জড়িয়ে, কর্পূরের মালা, জগন্নাথের প্রসাদ নিয়ে। দাসীদের সঙ্গে আমরাও ঘিরে বসতেম তাকে। প্রথমটা সে মেঝেতে খড়ি পেতে গুণে দিতো দাসীদের মধ্যে কার কপালে

ক্ষেত্তরে যাওয়া আছে, না আছে। তারপর প্রসাদ বিতরণ করে সে শ্রীক্ষেত্রের গল্প করতে থাকতো পট দেখিয়ে। সেই পট, নামাবলি, কর্পূরের মালা সব ক'টার রঙ মিলে শ্রীক্ষেত্রের সমুদ্র বালি পাথর ইত্যাদির একটা রঙ ধরেছিলো মনটা।

অল্প কয় বছর হলো যখন পুরী দেখলেম প্রথম, তখন সেই সব রঙগুলোকেই আবার দেখতে পেলেম, যেন অনেক কাল আগে দেখা রঙ। নৌকো, পালকি, মন্দির, বালি, কাপড়—সমস্ত জিনিস শাদা, হলুদ, কালো ও নীল—চারটি বহুকালের চেনা রঙের ছোপ ধরিয়ে রেখেছে!

আর একজন সাহেব আসতো, তার নাম রুবারীয়ো। জাতে পর্তুগীজ ফিরিঙ্গী—মিশকালো। বড়োদিনের দিন সে একটা কেক নিয়ে হাজির হতো। তাকে দেখলেই শুধোতেম—'সাহেব আজ তোমাদের কী?' সাহেব অমনি নাচতে নাচতে উত্তর দিতো, আজ আমাদের কিসমিস্।' সাহেবের নাচন দেখে আমরা তাকে ঘিরে খুব একচোট নেচে নিতেম।

নতুন কিছু পাখি কিংবা নিলেমে গাছ কেনার দরকার হলে, বৈকুণ্ঠবাবুর ডাক পড়তো। দেখতে বেঁটে-খাটো মানুষটি, মাথায় টাক, রাজ্যের পাখি, গাছ আর নিলেমের জিনিসের সংগ্রহ করতে ওস্তাদ ছিলেন ইনি। তখন স্যার রিচার্ড টেম্পল ছোটোলাট—ভারি তাঁর গাছের বাতিক। বৈকুণ্ঠবাবু নিলেমে ছোটোলাটের ডাকের উপর ডাক চড়িয়ে, অনেক টাকার একটা গাছ আমাদের গাছ-ঘরে এনে হাজির করলেন। ছোটোলাট খবর পেলেন—গাছ চলে গেছে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-বাড়িতে। সঙ্গে সঙ্গে লাটের চাপরাশি পত্র নিয়ে হাজির—ছোটোলাট বাগান দেখতে ইচ্ছে করেছেন। উপায় কী, সাজ-সাজ রব পড়ে গেলো। আমার মখমলের কোট-প্যান্ট আবার সিন্দুক থেকে বার হলো। সেজেগুজে বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখলেম—ঘোড়ায় চড়ে ছোটোলাট এলেন। খানিক বাগানে ঘুরে একপাত্র চা খেয়ে বিদায় হলেন। বৈকুণ্ঠবাবুর ডেকে-আনা গাছটাও চলে গেলো জোড়াসাঁকো থেকে বেলভেডিয়ার পার্কে। বৈকুণ্ঠবাবুর বাসা ছিলো পাথুরেঘাটায়, সেখান থেকে নিত্য হাজিরি দেওয়া চাই এখানে। একবার ঘোর বৃষ্টিতে রাস্তাঘাট ডুবে এক কোমর জল দাঁড়িয়ে যায়। বৈকুণ্ঠবাবু গলির মোড়ে আটকা—অন্যের যেখানে হাঁটু-জল। বৈকুণ্ঠবাবুর সেখানে ডুব-জল— এতো ছোটো ছিলেন তিনি।

কাজেই একখানা ছোট্ট নৌকা পুকুর থেকে টেনে তুলে তবে তাঁকে চাকরেরা উদ্ধার করে আনে। ছোট মানুষটি, কিন্তু ফন্দি ঘুরতো অনেক রকম তাঁর মাথায়। কতো রকমই যে ব্যবসার মতলব করতেন তিনি তার ঠিক নেই। একবার বড়ো জেঠামশায় এক বাক্স নিব কিনে আনতে বৈকুণ্ঠবাবুকে হুকুম করেন। তিনি নিলেম থেকে একটা গরুরগাড়ি বোঝাই নিব কিনে হাজির! আর একবার এক গাড়ি বিলিতি এসেন্স এনে হাজির বাবামশায়ের জন্য। দেখে সবাই অবাক, হাসির ধুম পড়ে গেলো। এই ছোট্ট মানুষটিকে প্রকাণ্ড স্বপ্ন ছাড়া ছোট্টখাটো স্বপ্ন দেখতে কখনো দেখলেম না শেষ পর্যন্ত। বিচিত্র চরিত্রের সব মানুষের দেখা পেলেম তিনতলা থেকে ছাড়া পেয়েই।

অসমাপিকা

উড়ো ভাষায় এসে গেলো হাতে-খড়ির খবরটা আমার কানে। কিন্তু রামলাল রেখেছিলো পাকা খবর ঠিক কখন, কোন তারিখে, কোন মাসে হবে হাতে-খড়িটা। কেননা এই শুভ-কাজে তার কিছু পাওনা ছিলো। কাজেই সে ঠিক সময় বুঝে, রাত ন'টার আগেই আমাকে খাঁচার মধ্যে বন্ধ করে বললে, 'ঘুমিয়ে নাও, সকালে হাতে-খড়ি, ভোরে ওঠা চাই।'

দু'কানের মধ্যে দুটো কথা—'ভোরে ওঠা', 'হাতে-খড়ি'—থেকে থেকে মশার মতো বাঁশি বাজিয়ে চললো। অনেক রাত পর্যন্ত ঘুম আসতে দেরি করে দিয়ে, ঠিক ভোরে আমাকে একটু ঘুমোতে দিয়ে পালালো কথা দুটো। পাছে হাতে-খড়ির শুভ-লগ্নটা উতরে যায়, রামলালের চেয়েও সজাগ ছিলো আমাদের ঠাকুরঘরের বামুন! সে ঠিক আজকের একজন স্টেশন মাস্টারের মতো দিলে ফার্স্ট বেল। রামলালও বলে উঠল—'চল আর দেরি নেই।'

পাছে দেরি হয়ে পড়ে, সে জন্যে পা চালিয়ে চললো রামলাল। একতলায় তোষাখানা থেকে নানা গলি-ঘুঁজি সিঁড়ি উঠোন পেরিয়ে চলতে চলতে দেখছি কাঠের গরাদে-আঁটা একটা জানলা—সেই জানলার ওপারে অন্ধকারে ঘরের মধ্যে কালো একটা মূর্তি একটা মোটা জালা থেকে কি তুলছে। লোকের শব্দ পেয়ে সে মূর্তিটা গোল দুটো চোখ নিয়ে আমার দিকে দেখতে থাকলো। এর অনেক কাল পরে জেনেছিলেম এ-লোকটা আমাদের কালীভাণ্ডারী—রোজ এর হাতের রুটিই খাওয়ায় রামলাল। কালী লোকটা ছিলো ভালো, কিন্তু চেহারা ছিল ভীষণ। আলিবাবার গল্পের তেলের কুপো আর ডাকাতের কথা পড়ি আর মনে পড়ে এখনো কালীর সেদিনের চোখ, গরাদে-আঁটা ঘর আর মেটে জালা। ভাঁড়ারঘর পেরিয়ে এক ছোটো উঠোন—জলে-ধোওয়া, লাল টালি বিছানো। সেখান থেকে ছাতের-ঘরের ঠাকুর-ঘরের উত্তর দেওয়াল দেখা যায়, কিন্তু সেখানে পৌঁছতে সহজে পারিনি। উঠোনের উত্তর-ধারে চার-পাঁচটা সিঁড়ি উঠে একটা ঘর-জোড়া মেটে সিঁড়ি সোজা দোতলায় উঠেছে। এই সিঁড়ির গায়েই পাল্‌কি নামবার ঘর। সেটা ছাড়িয়ে একটা সরু গলি—একধারে দেওয়াল, অন্যধারে কাঠের বেড়া। গলিটা পেরিয়ে এলেম একটা ছাত আর সরু একটা বারান্দা। তারই একপাশে সারি সারি মাটির উনুন গাঁথা আছে—দুধ জ্বাল দেবার, লুচি ভাজবার স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র চুল্লি। এই সরু বারান্দা, সরু গলির শেষে, চার-পাঁচ ধাপ সিঁড়ি—অন্ধকার আর ঘোরতর ঘর্ঘর শব্দ পরিপূর্ণ একটা ছোটো ঘরে নেমে গেছে। ঘরের মেঝেটা থরথর করে পায়ের তলায় কাঁপছে টের পেলেম। সেখানে দেখলেম একটা দাসী, হাত দুখানা তার মোটা মোটা—গোল দুখানা পাথর একটার উপর আর একটা রেখে, একটা হাতল ধরে ক্রমাগত ঘুরিয়ে চলেছে—পাশে তার স্তূপাকার করা সোনামুগ। এই ডাল দিয়ে যে রুটি খাই তা কি তখন

জানি? সে-ঘরটা পেরিয়ে আর একটা উঠোনের চক-মিলানো বারান্দা। সেখানে পৌঁছে একটা চেনা লোক—অমৃত দাসী—সে একটা শিল আর নোড়ায় ঘষা-ঘষি করে শব্দ তুলছে ঘটর-ঘটর! এক মুঠো কি সে শিলের উপরে ছেড়ে দিয়ে খানিক নোড়া ঘষে দিলে ঘটাঘট, অমনি হয়ে গেলো লাল রঙের একটা পদার্থ। অমনি হলুদ, সবুজ, শাদা, কতো কি রঙ বাটছে বসে বসে সে—কে জানে তখন সেগুলো দিয়ে কালিয়া, পোলাও, মাছের ঝোল, ডাল, অম্বল রঙ করা হয় ভাত খাবার বেলায়। এখান থেকে টালি-খসা ফোকলা একটা মেটে সিঁড়ি ঘুরে ঘুরে ঠাকুর-ঘরের ঠিক দরজায় গিয়ে দাঁড়ালেম। রামলাল ফস্ করে চটি-জুতোটা পা থেকে খুলে নিয়ে বললে—'যাও।'

ঠাকুরঘরের দেওয়ালে শাদা পঙ্খের প্রলেপ; খাটলে খাটলে ছোটো ছোটো সারি সারি কুলুঙ্গি; তারই একটাতে তেল-কালি-পড়া পিলসুজে পিদুম জ্বলছে সকাল বেলায়। ঠিক তারই নিচে, দেওয়ালের গায়ে, প্রায় মুছে গেছে এমন একটা বসুধারার ছোপ। ঘরের মেঝেয় একটা শাদা চুন-মাখানো দেলকো, আর আমপাতা, ডাব আর সিঁদুর মাখানো একটা ঘট। পুজোর সামগ্রী নিয়ে তারই কাছে পুরুত বসে; আর গায়ে নামাবলি জড়িয়ে হরিনামের মালা হাতে ছোটোপিশিমা। ধূপ-ধুনোর ধোঁয়ার গন্ধে ভরা ঘরের মধ্যেটায় কি আছে দেখবার আগেই আমার চোখ জ্বালা করতে থাকলো। তারপর কে যে সে মনে নেই, মেঝেতে একটা বড়ো ক লিখে দিলে। রামখড়ি হাতের মুঠোয় ধরে দাগা বুলোলেম—একবার, দু'বার, তিনবার। তার পরেই শাঁখ বাজলো, হাতে-খড়িও হয়ে গেলো।

পূজোর ঘর থেকে একটা বাতাসা চিবোতে চিবোতে ফিরতে থাকলেম এবারে। একেবারে একতলায় যোগেশদাদার দপ্তরে এসে একতাড়া তালপাতা, কঞ্চির কলম ও মাটির নতুন দোয়াত নিতে হলো, বাড়ির বুড়ো আধবুড়ো ছোকরা কর্মচারী সবারই পায়ের ধুলো ও আশীর্বাদের সঙ্গে—এ-ও মনে আছে। তারপর সদরে-অন্দরে সবাইকে দেখা দিয়ে কোথায় গেলেম, কি করলেম কিছুই মনে নেই। কিন্তু তার পরদিনই আবার সরস্বতী পুজোয় দোয়াত, কলম, বই, শেলেট রামলাল দিয়ে এলো, তা মনে পড়ে কিন্তু। গুরুমশায় বলে সেদিনের একটা কেউ আমার মনের খোপে ধরা নেই হাতে-খড়ির সকালটার সঙ্গে।

একটা অসমাপিকা ক্রিয়ার মতো এই হাতে-খড়ি ব্যাপারটা। এরই মতো আরো কতকগুলো অসমাপ্ত, কতকটা বায়োস্কোপের টুকরো ছবির মতো, মনের কোণে রয়েছে জমা।

খুব ছোটোবেলার একটা ঘটনার কথা। সেটা শুনে-পাওয়া সংগ্রহ মনের—মা বলতেন—আমাকে নিয়ে কাটোয়াতে যাচ্ছেন ছোটো পিশিমার শ্বশুরবাড়ি। পথে ধানক্ষেতের মাঝ দিয়ে পাল্কি চলেছে। সঙ্গের দাসী একগোছা ধানের শীষ ভেঙে মাকে দিয়েছে; তারই একটা শীষ মা দিয়েছেন আমাকে খেলতে। মা চলেছেন অন্যমনে মাঠ-ঘাট দেখতে দেখতে, বন্ধ পাল্কির ফাঁকে চোখ দিয়ে। সেই ফাঁকে হাতের ধান-শীষ মুখের মধ্যে দিয়ে গিয়ে আমার গলায় বেধে দম বন্ধ করে আর কি! এমন সময়—এ-ঘটনা বারবার বলতেন মা, কিন্তু এ-ঘটনা কোনো কিছু স্মৃতি কি ছবির সঙ্গে জড়িয়ে দেখতে পেতো না মন। যেন মনের ঘুমন্ত অবস্থার ঘটনা এটা জন্মের পরের, কিন্তু মনের ছাপাখানা খোলার পূর্বের ঘটনা।

পুরনো বৈঠকখানা-বাড়িটা অনেক অদলবদল জোড়া-তাড়া দিয়ে হয়েছে জোড়াসাঁকোর আমাদের এই বসত বাড়িটা। খাপছাড়া রকমের অলি, গলি, সিঁড়ি, চোর-কুঠরি, কুলুঙ্গি ইত্যাদিতে ভরা এই বাড়ি, খানিক সমাপ্ত খানিক অসমাপ্ত ছবি ও ঘটনার ছাপ আপনা হতেই দিতো তখন মনের উপরে। অন্দর-বাড়ি থেকে রান্না-

বাড়িতে যাবার একটা গলি পথ; ছোটোখাটো একটা উঠোনের পশ্চিম গায়ে, সরু দুটো মেটে সিঁড়ির মাথায়, দোতলার উপর ধরা এই গলিটার পশ্চিম দেওয়ালে পিদুম দেবার একটা কুলুঙ্গি। বাড়ির আর সব কুলুঙ্গি ক'টা ছিলো মেঝে ছেড়ে অনেক উপরে, ছোটো আমাদের নাগালের বাইরে। কিন্তু এই কুলুঙ্গিটা—ঠিক একটি পূর্ণ চন্দ্র যতো বড়ো দেখা যায় ততো বড়ো—আর সব কুলুঙ্গি থেকে স্বতন্ত্র হয়ে মেঝে থেকে নেমে পড়েছিলো। দেখে মনে হতো সেটাকে, যেন একটা রবারের গোলা, ভুঁয়ে পড়ে একটু লাফিয়ে উঠে শূন্যে দাঁড়িয়ে গেছে। লুকোবার অনেকগুলো জায়গা ছিলো আমাদের, তার মধ্য এও ছিলো একটা। ইঁদুর যেমন গর্তে গুটিসুটি বসে থাকে, তেমনি এক-একদিন গিয়ে বসতেম সকারণে, অকারণেও। পুব-পশ্চিমে দেওয়াল-জোড়া গলি, ছাওয়া দিয়ে নিকোনো। নানা কাজে ব্যস্ত চাকর-দাসী, তারা এই পথটুকু চকিতে মাড়িয়ে যাওয়া-আসা করে— আমাকে দেখতেই পায় না। আমি দেখি তাদের খালি কালো কালো পায়ের চলাচল।

ঠিক আমার সামনেই একতলার ঘরের একটা মেটে সিঁড়ি একতলার একটা তালাবন্ধ সেকেলে দরজার সামনে পা রেখে, দোতলায় মাথা রেখে, আড় হয়ে পড়ে থাকে—যেন একটা গজগীর দৈত্য আজব শহরের তেল-কালি-পড়া সিংহদ্বার আগলে ঘুম দিচ্ছে এই ভাব। এলা-মাটির উপরে সোঁতা অন্ধকার—তারই দিকে চেয়ে বসে থাকি লুকিয়ে চুপচাপ। বেশিক্ষণ একলা থাকতে হতো না, ঘড়ি ধরে ঠিক সময়ে সিঁড়ির গোড়ায় বিছিয়ে পড়তো রোদ—একখানি সোনায় বোনা নতুন মাদুর যেন। থাকতে থাকতে এরই উপর দিয়ে আগে আসতো এক ছায়া, তার পাছে প্রায় ছায়ারই মতো একটি বুড়ি গুটিগুটি। তার লাঠির ঠকঠক শব্দ জানাতো যে সে ছায়া নয়, কায়া। বুড়ি এসে চুপ করে বসে যেতো তালাবন্ধ কপাটের একপাশে। বসে থাকে তো বসেই থাকে বুড়ি। সিঁড়ি আড় হয়ে পড়ে থাকে তো থাকেই—সাড়া-শব্দ দেয় না দুজনে কেউ! রোদ ক্রমে সরে, একটু একটু করে আলো এলা-মাটির দেওয়ালগুলোকে সোনার আভায় একটুক্ষণের জন্যে উজলে দিয়ে, মাদুর গুটিয়ে নিয়ে যেন চলে যায়। সেই সময় একটা ভিখিরী দুটো লাঠির উপর ভর দিয়ে যেন ঝুলতে-ঝুলতে এসে বসে বন্ধ-দরজার অন্য পাশে, হাতে তার একটা পিতলের বাটি। সে বসে থাকে, নেকড়া-জড়ানো খোঁড়া পা একটা সিঁড়িটার দিকে মেলিয়ে গম্ভীর ভাবে। বুড়ো বুড়ি কারু মুখে কথা নেই। কোথা থেকে বড়ো বৌঠাকরুণের পোষা বেড়াল 'গোলাপী'—গায়ে তিন রঙের ছাপ—মোটা ল্যাজ তুলে বুড়ির গা ঘেঁষে গিয়ে বলে মিঁয়া! বুড়ো ভিখিরী অমনি হাতের লাঠিটা ঠুকে দেয়। বেড়াল দৌড়ে সিঁড়ি বেয়ে উপরতলায় উঠে আসে! ঠিক এই সময় শুনি, ঠাকুরঘরে ভোগের ঘণ্টা শাঁখ বেজে ওঠে। অমনি দেখি বুড়ো বুড়ি দুটোতে চলে গেলো—ঠিক যেন নেপথ্যে প্রস্থান হলো তাদের থিয়েটারে। কুলুঙ্গিতে বসে আমি শুনতে থাকলেম কাসঁর বাজছে—

তারপর··তারপর··তারপর··একদিন সকালে আমাদের দক্ষিণের বারান্দার সামনে লম্বা ঘরে চায়ের মজলিস বসেছে। পেয়ারী বাবুর্চি উর্দি পরে ফিটফাট হয়ে সকাল থেকে দোতলায় হাজির। আমার সেই নীল মখমলের সেকেণ্ড-হ্যাণ্ড কোট আর শর্ট প্যান্টটার মধ্যে পুরে রামলাল আমাকে ছেড়ে দিয়েছে—যতোটা পারে চায়ের মজলিস থেকে দূরে।

কে জানে সে কে একজন—মনে তার চেহারাও নেই, নামও নেই—সাহেব-সুবো গোছের মানুষ, চা খেতে খেতে হঠাৎ আমাকে কাছে যেতে ইশারা করলেন। চায়ের ঘরে ঢুকতে মানা ছিলো পূর্বে। কাজেই, আমি ধরা পড়েছি দেখে পালাবার মতলবে আছি, এমন সময় রামলাল কানের কাছে চুপি চুপি বললে, 'যাও ডাকছেন, কিন্তু দেখো, খেও না কিছু।' সাহস পেলেম, সোজা চলে গেলেম টেবিলের কাছে, যেখানে রুটি বিস্কুট, চায়ের

পেয়ালা, কাচের প্লেট, তখমা-ঝোলানো বাবুর্চি, আগে থেকে মনকে টানছিলো। ভুলে গেছি তখন রামলালের হুকুমের শেষ ভাগটা। ঘরের মধ্যে কি ঘটনা ঘটলো তা একটুও মনে নেই। মিনিট কতক পরে একখানা মাখন মাখানো পাঁউরুটি চিবোতে চিবোতে বেরিয়ে আসতেই আড়ালে কেদারদাদার সামনে পড়লেম। ছেলে মাত্রকে কেদারদাদার অভ্যাস ছিলো 'শালা' বলা। তিনি আমার কানটা মলে দিয়ে ফিসফিস করে বললেন—'যাঃ, শালা, ব্যাপটাইজ হয়ে গেলি।' রামলাল একবার কটমট করে আমার দিকে চেয়ে বললে—'বলেছিলুম না, খেও না কিছু।'

কি যে অন্যায় হয়ে গেছে তা বুঝতে পারিনে; কেউ স্পষ্ট করেও কিছু বলে না। দাসীদের কাছে গেলে বলে—'মাগো, খেলে কি করে?' ছোটো বোনেরা বলে বসে—'তুমি খেয়েছো, ছোঁব না!' বড়োপিশি মাকে ধমকে বলেন—'ওকে শিখিয়ে দিতে পারোনি, ছোটোবৌ!'

যে ভদ্রলোক চা খেতে এসেছিলেন তিনি তো গেলেন চলে খাতির-যত্ন পেয়ে। কেদারদাদাও গেলেন শিকদারপাড়ার গলিতে। কিন্তু 'ব্যাপটাইজ' কথাটা আমার আর কাছ-ছাড়া হয় না। রুটিখানা হজম হয়ে যাবার অনেক ঘন্টা পরে পর্যন্ত আমার মনে কেমন একটা বিভীষিকা জাগতে থাকলো। কারো কাছে এগোতে সাহস হয় না। চাকরদের কাছে তোষাখানায় যাই, সেখানে দেখি রটে গেছে ব্যাপটাইজ হবার ইতিহাস। দপ্তরখানায় পালাই, সেখানে যোগেশদাদা মথুরাদাদাকে ডেকে বলে দেন—আমি 'ব্যাপটাইজ' হয়ে গেছি। এমনি একদিন দু'দিন কতোদিন যায় মনে নেই—একলা একলা ফিরি, কোথাও আমল পাইনে, শেষে একদিন ছোটোপিশিমা আমায় দেখে বললেন—'তোর মুখটা শুকনো কেন রে?'

মনের দুঃখ তখন আর চাপা থাকলো না—'ছোটোপিশিমা, আমি ব্যাপটাইজ হয়ে গেছি!' ছোটোপিশি জানতেন হয়তো 'ব্যাপটাইজ' হওয়ার কাহিনী এবং যদি বিনা দোষে কেউ 'ব্যাপটাইজ' হয় তো তার উদ্ধার হয় কিসে, তাও তাঁর জানা ছিলো। তিনি রামলালকে একটু আমার মাথায় গঙ্গাজল দিয়ে আনতে বললেন।

চললো নিয়ে আমাকে রামলাল ঠাকুরঘরে।

পাহারাওয়ালার সঙ্গে যেমন চোর, সেইভাবে চললেম রামলালের পিছনে পিছনে। রান্না-বাড়ির উঠোনের পুব-গায়ে, সরু মেটে সিঁড়ি বেয়ে উঠে যেতে হয় ঠাকুর-বাড়ি। এই সিঁড়ির মাঝামাঝি উঠে, দেওয়ালের গায়ে চৌকো একটা দরজা ফস্ করে খুলে, রামলাল বললে—'এটা কি জানো? চোর-কুটুরি, পেত্নী থাকে এখানে।' আর বলতে হলো না, সোজা আমি উঠে চললেম সিঁড়ি যেখানে নিয়ে যাক ভেবে। খানিক পরে রামলালের গলা পেলেম—'জুতো খুলে দাঁড়াও, পঞ্চগব্যি আনতে বলি।' ভয়ে তখন রক্ত জল হয়ে গেছে। ছোটোপিশি দিয়েছেন হুকুম গঙ্গাজলের; কেন যে রামলাল পঞ্চগব্যির কথা তুলছে, সে-প্রশ্ন করার মতো অবস্থার বাইরে গেছি তখন। মনও দেখছি সেই পর্যন্ত লিখে বাকিটা রেখেছে অসমাপ্ত।

বসত-বাড়ি

মানুষের সঙ্গ পেয়ে বেঁচে থাকে বসত-বাড়িটা। যতোক্ষণ মানুষ আছে বাড়িতে, ভূত ভবিষ্যত বর্তমানের ধারা বইয়ে ততোক্ষণ চলেছে বাড়ি হাব-ভাব চেহারা ও ইতিহাস বদলে বদলে। কালে কালে স্মৃতিতে ভরে, বাড়ি-স্মৃতির মাঝে বেঁচে থাকে বাড়ির সমস্তটা। বাড়ি ঘর জিনিসপত্র সবই স্মৃতির গ্রন্থি দিয়ে বাঁধা থাকে একালের সঙ্গে। এইভাবে চলতে চলতে, একদিন যখন মানুষ ছেড়ে যায় একেবারে বাড়ি, স্মৃতির সূত্রজাল ঊর্ণার মতো উড়ে যায় বাতাসে; তখন মরে বাড়িটা যথার্থ ভাবে। প্রত্নতত্ত্বের কোঠায় পড়ে জানায় শুধু, সেটা দিশী ছাঁদের না বিদেশী ছাঁদের, মোগল ছাঁদের না বৌদ্ধ ছাঁদের। তারপর একদিন আসে কবি, আসে আর্টিস্ট। বাঁচিয়ে তোলে মরা ইঁট কাঠ পাথর এবং ইতিহাস-প্রত্নতত্ত্বের মুর্দাখানার নম্বর-ওয়ারি করে ধরা জিনিসপত্রগুলোকেও তারা নতুন প্রাণ দিয়ে দেয়। সঙ্গ পাচ্ছে মানুষের, তবে বেঁচে উঠছে ঘর বাড়ি সবই। আমি বেঁচে আছি পুরনোর সঙ্গে নতুন হতে হতে; তেমনি বেঁচে আছে এই তিনতলা বাড়িটাও, আজ যার মধ্যে বাসা নিয়ে বসে আছি আমি। আজ যদি কোনো মাড়োয়ারী দোকানদার পয়সার জোরে দখল করে এ-বাড়িটা, তবে এ-বাড়ির সেকাল-একাল দুই-ই লোপ পেয়ে যাবে নিশ্চয়। যে আসবে তার সেকাল নয়, শুধু একালটাই নিয়ে সে বসবে এখানে। দক্ষিণের বাগান ফুঁয়ে উড়িয়ে ওখানে বসাবে বাজার, জুতোর দোকান, ঘি-ময়দার আড়ৎ ও নানা—যাকে বলে প্রফিটেবল্—কারখানা, তাই বসিয়ে দেবে এখানে। সেকাল তখন স্মৃতিতেও থাকবে না।

স্মৃতির সূত্র নদীধারার মতো চিরদিন চলে না, ফুরোয় এক সময়। এই বাড়িরই ছেলেমেয়ে—তাদের কাছে আমাদের সেকালের স্মৃতি নেই বললেই হয়। আমার মধ্যে দিয়ে সেই স্মৃতি—ছবিতে, লেখাতে, গল্পে—যদি কোনোগতিকে তারা পেলো তো বর্তে রইতো সেকাল বর্তমানেও। না হলে, পুরনো ঝুলের মতো, হাওয়ায় উড়ে গেলো একদিন হঠাৎ কাউকে কিছু না জানিয়ে!

(সমাপ্ত)

আপন কথা • অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আনন্দ

॥ ই-বুকটি সমাপ্ত হল ॥